বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার ও রিমান্ড

হাইকোর্টের নির্দেশনা ও বাস্তবতা

BLAST

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative

বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার ও রিমান্ড:
হাইকোর্টের নির্দেশনা ও বাস্তবতা

BLAST

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

ব্লাস্ট ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি জাতীয় আইন সেবা ও মানবাধিকার সংগঠন। সারাদেশে ১৯টি জেলা কার্যালয় ও আইন সহায়তা ক্লিনিকের মাধ্যমে ব্লাস্ট আইন সহায়তা প্রার্থীদের নিম্ন আদালত থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত আইন সহায়তা দিয়ে থাকে। ব্লাস্ট তৃণমূল পর্যায়ে মানবাধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি, আইনী পরামর্শ এবং মামলা ও মধ্যস্থতা পরিচালনা করে। অধিকার ও আইনী সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এডভোকেসির অংশ হিসেবে ব্লাস্ট জনস্বার্থে মামলাও পরিচালনা করে। বিস্তারিত জানার জন্য লগ ইন করুন: www.blast.org.bd

© বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৫

ডিজাইন ও প্রচ্ছদ: এক্সিকিউট

মুদ্রণ: প্রিন্টেক

প্রকাশনায়:
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
প্রধান কার্যালয়
১/১, পাইওনিয়ার রোড,কাকরাইল, ঢাকা ১০০০
টেলিফোন: +৮৮(০২) ৮৩৯১৯৭০-২, ৮৩১৭১৮৫
ফ্যাক্স: +৮৮(০২) ৮৩৯১৯৭৩
ই-মেইল: mail@blast.org.bd
ওয়েব: www.blast.org.bd
ফেসবুক: www.facebook.com/BLASTBangladesh

গ্রন্থস্বত্বগত অবস্থান

এই প্রকাশনাটির অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ অবাধে পর্যালোচনা, পরিমার্জনা, পুনর্মুদ্রণ এবং অনুবাদ করা যেতে পারে, কিন্তু তা কোনভাবেই বিক্রয়ের জন্য বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। এই প্রকাশনার কোন পরিবর্তনে ব্লাস্টের অনুমোদন আবশ্যক এবং প্রকাশনাটির যেকোন তথ্য, উপাত্ত ব্যবহারে ব্লাস্টের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। যেকোন অনুসন্ধানের জন্য ই-মেইল করুন: publication@blast.org.bd

মুখবন্ধ

মহামান্য হাইকোর্ট ২০০৩ সালে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারায় গ্রেফতার ও রিমান্ডের ক্ষেত্রে ১৫টি নির্দেশনা প্রদান করেন যা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য বাধ্যকর। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা প্রদানের এক যুগ পার হওয়ার পর এখন পর্যন্ত এ সংক্রান্ত আইনে কোন সংশোধন হয়েছে কিনা, আদালত ও তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ নির্দেশনাসমূহ কতটুকু বাস্তবায়ন করছে তা পর্যালোচনা ও অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করা, এ বিষয়ে জনগণের ধারণা বা সচেতনতা পরিমাপ করা এবং নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে বিভিন্ন পর্যায়ে কি কি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন তা খতিয়ে দেখতে ব্লাস্ট 'গ্রেপ্তার ও রিমান্ড: মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা ও বাস্তবতা' শিরোনামে গবেষণা সমীক্ষা সম্পাদন করে। গবেষণা সমীক্ষাটির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ড. জাহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পূর্নবিন্যাসে এডভোকেট তাজুল ইসলাম এবং মূল ইংরেজী প্রতিবেদনটি বাংলা অনুবাদে সাংবাদিক আবু সাঈদ খান অবদান রাখায় ব্লাস্ট তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করে এটিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেন ব্লাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সহ-সভাপতি বিচারপতি আওলাদ আলী, সদস্য ড. সামসুল বারী ও এডভোকেট ফজলুল হক। গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশনায় সার্বিক সহযোগিতা করেন ব্লাস্টের উপ-পরিচালক মোস্তফা জামিল ও মাহবুবা আক্তার, কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট হুমায়ুন কবীর খান ও প্রকল্প কর্মকর্তা মুবিনুল মুলক। এছাড়াও অনেক উত্তরদাতা তথ্য প্রদান করে এই গবেষণা প্রতিবেদনটি সমৃদ্ধ করেছেন এবং তথ্য সংগ্রহের কাজে অনেকে সহায়তা করেছেন ব্লাস্ট তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

ধন্যবাদ।

সারা হোসেন
অনারারী নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

সূচিপত্র

১. ভূমিকা ১

১.১ গবেষণার যৌক্তিকতা

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

১.৩ গবেষণার পদ্ধতি

১.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

২. গ্রেফতার ও রিমান্ড সম্পর্কিত আইন ও হাইকোর্টের নির্দেশনা ৬

২.১ গ্রেফতার ও রিমান্ড সম্পর্কিত আইন

২.২ ব্লাস্ট ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ
ও অন্যান্য মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশনাসমুহ

৩. হাইকোর্টের নির্দেশনা বাস্তবায়ন: মূল পর্যবেক্ষণসমূহ ১১

৩.১ বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার ও গ্রেফতারের কারণ অবহিত করা

৩.১.১ বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার

৩.১.২ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদেরকে গ্রেফতারের কারণ অবহিতকরণ

৩.১.৩ গ্রেফতারকালে পরিবারের সদস্য বা স্বজনদের অবহিতকরণ

৩.২ গ্রেফতারের সময় ও পরে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির অধিকার

৩.২.১ আইনজীবী ও নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে পরামর্শ

৩.২.২ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে আদালতে হাজির

৩.২.৩ গ্রেফতারের সময় ও পরে পুলিশের আচরণ

৩.২.৪ গ্রেফতারের সময় ও পরে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির চিকিৎসা

৩.৩ রিমান্ডের আগে ও পরে আটককৃত ব্যক্তির অধিকার

৩.৩.১ রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের সময় নির্যাতন

৩.৩.২ রিমান্ডে আদালতের নির্দেশিত কক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ

৩.৩.৩ রিমান্ডের আগে ও পরে মেডিকেল সার্টিফিকেট

৩.৩.৪ রিমান্ডের সময় আত্মীয়-স্বজন ও আইনজীবীর উপস্থিতি

৩.৩.৫ ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭ ধারার প্রয়োগ বা রিমান্ড

৩.৪ হাইকোর্টের নির্দেশনা সম্পর্কে সচেতনতা

৪. ফৌজদারি কার্যবিধি ছাড়া অন্যান্য আইনে বেআইনী গ্রেফতারের ক্ষেত্র ও পরিধি ২৯

৫. গ্রেফতার ও রিমান্ড সম্পর্কিত আইনগত ও বিচারিক অগ্রগতি ৩১

৫.১ মো: সাইফুজ্জামান বনাম রাষ্ট্র ও অন্যান্য মামলায় হাই কোর্টের নির্দেশনা

৫.২ নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩

৬. উপসংহার ও সুপারিশসমূহ ৩৬

৬.১ উপসংহার

৬.২ সুপারিশসমুহ

৬.২.১ সরকারের জন্য

৬.২.২ নাগরিক সমাজের জন্য

৭. সংযুক্তি ও তথ্যসূত্রঃ ৪২

ভূমিকা

রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেমন, পুলিশ ও র‍্যাবের দায়িত্ব জননিরাপত্তা ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা, কিন্তু তাদের ভূমিকাই আজ প্রশ্নবিদ্ধ। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের নানা অভিযোগ রয়েছে। ক্ষমতার অপব্যবহারে তাদের বড় অবলম্বন হচ্ছে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারার অপপ্রয়োগ। এই ধারা গুলোর অপপ্রয়োগের ফলে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার ও পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনের ঘটনা হরহামেশাই ঘটে চলেছে। ফলে প্রাণ হারিয়েছে রুবেল, সীমা, জামাল, অরুণ চক্রবর্তী সহ অনেকেই। প্রশ্ন হচ্ছে কোন অধিকার বলে পুলিশ এধরণের কার্যকলাপ করে? দেশের আইন কি আদৌ তা অনুমোদন করে? পুলিশের এ সব কার্যকলাপ কেবল ফৌজদারি কার্যবিধির অপপ্রয়োগই নয়, সংবিধানেরও সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

সংবিধানের ৩৩ ও ৩৫ অনুচ্ছেদে গ্রেফতার ও পুলিশ হেফাজতে আটককৃত ব্যক্তির মৌলিক অধিকার হিসেবে কিছু অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। এই মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের কারণ জানানো এবং আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করতে দেয়া, গ্রেফতারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ম্যাজিস্টেটের নিকট উপস্থাপন করা, ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া পুলিশ হেফাজতে আটক না রাখা এবং সকল প্রকার নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকা। এ ছাড়াও সংবিধানের ২৭, ৩১ এবং ৩২ অনুচ্ছেদে প্রত্যেক নাগরিকের সমান আইনগত সুরক্ষা, গ্রেফতার ও আটক এবং বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষাকবচ হিসেবে অনেকগুলো মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছে যা আইন শৃংখলা বাহিনীর হাতে নানাভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে।

ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রুবেলকে ডিবি পুলিশ রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী এলাকা থেকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে অমানবিক নির্যাতন করলে ১৯৯৮ সালের ২৩ জুলাই মিন্টো রোডের গোয়েন্দা পুলিশ কার্যালয়ে তার মৃত্যু হয়। চট্টগ্রামের রাউজানে ১৯৯৭ সালে সীমা চৌধুরী নামে একজন নারী পুলিশ হেফাজতে ধর্ষিত হয়ে মারা যান। অরুণ চক্রবর্তী নামে আরো এক যুবক ঢাকার মালিবাগ থানার পুলিশ হেফাজতে প্রান হারান। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), আইন ও সালিশ কেন্দ্র, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন এবং আরো কতিপয় ব্যক্তি হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন দায়ের করে। যেটি ব্লাস্ট ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ ও অন্যান্য বা "৫৪ ধারার মামলা"[১] নামে পরিচিত। এ মামলায় ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় সন্দেহবশত: বিনা পরোয়ানায় কাউকে গ্রেফতার এবং ১৬৭ ধারায় অধিকতর তদন্তের নামে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে রিমান্ডে নিয়ে আইনের অপপ্রয়োগের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের

১ ব্লাস্ট ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ ও অন্যান্য ৫৫ ডিএলআর (এইচসিডি) (২০০৩) ৩৬৩

ফলে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু ঘটানোর কর্মকান্ডের সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়। আইন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রাণালয়, পুলিশের মহাপুলিশ পরিদর্শক, উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, সহকারি পুলিশ সুপার সহ ৫ জনকে বিবাদী করে এ পিটিশন দায়ের করা হয়। রিট পিটিশনে গ্রেফতার ও তদন্ত সংক্রান্ত প্রচলিত আইন ও সাংবিধানিক বিধি বিধান (অনুচ্ছেদ ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৫) যথাযথভাবে পালন এবং গ্রেফতারের পর পরই আসামীকে আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগদানের জন্য আবেদন করা হয়। এই পিটিশনে রুবেল হত্যার মর্মান্তিক ঘটনায় বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধান দলের রিপোর্টে পেশকৃত ১১টি সুপারিশমালার[২] ভিত্তিতে আদালতের কাছে দিক নির্দেশনার আবেদনও জানানো হয়। মাননীয় হাইকোর্ট ১৯৯৮ সালের ২৯ শে নভেম্বর সন্দেহবশত: কাউকে গ্রেফতার এবং তদন্তের নামে রিমান্ডে এনে আসামীকে শারীরিক নির্যাতন করা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে কেন নির্দেশ দেয়া হবে না, সে ব্যাপারে সরকারের ওপর রুলনিশি জারী করেন।

রুলের ওপর শুনানি শেষে ৭ই এপ্রিল ২০০৩ বিচারপতি মোঃ হামিদুল হক এবং বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা সংশোধনের জন্য এক যুগান্তকারী রায় প্রদান করেন। উক্ত রায়ে হাইকোর্ট বেঞ্চ ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার ও ১৬৭ ধারায় রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রচলিত বিধান পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে সংশোধন করার জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি এই ধারাগুলো সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত রায় ঘোষণার পর থেকেই সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও কর্তৃপক্ষকে ১৫ দফা নির্দেশনা মেনে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারার অপপ্রয়োগ রোধ ও আইনগত অধিকার সমুন্নত রাখতে আদালতের নির্দেশনাগুলো রায় প্রদানের দিন থেকে পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে সময় বেঁধে দেওয়া হয়। তবে সরকার কর্তৃক সংশোধিত আইন প্রণয়ন হওয়ার আগ পর্যন্ত আদালতের রায় ঘোষণার দিন থেকেই তা অনুসরণ করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

আদালত ৫৪ ধারায় গ্রেফতার ও ১৬৭ ধারায় রিমান্ড আদেশের ক্ষেত্রে ১৫ টি নির্দেশনা দিয়েছেন। যা আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে পালনীয়। মামলাটি সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে বিচারাধীন রয়েছে, তবে আপীল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনাগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন স্থগিতাদেশ দেয়নি ফলে এই নির্দেশনাগুলো সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য বাধ্যকর।[৩] ঐতিহাসিক এই রায় ঘোষণার পর ৯ বছর পেরিয়েছে। এ সময়ের মধ্যে রায়ের

২ রুবেলের মৃত্যু তদন্তের জন্য এক সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান খানের সুপারিশ ও নির্দেশনা (ব্লাস্ট বুলেটিনের বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারী ২০০৮)

৩ সিভিল লিভ টু আপীল নং ৪৯৮/২০০৩ (বাংলাদেশ ও অন্যান্য বনাম ব্লাস্ট ও অন্যান্য মামলায় আপীল বিভাগের ০২/০৮/২০০৩ তারিখের আদেশ দেখুন)

নির্দেশনাগুলো কতটুকু অনুসরণ করা হচ্ছে, বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার ও তদন্ত সংক্রান্ত প্রচলিত আইন পরিবর্তনে সরকার কি ভাবছে তা পর্যালোচনার দাবী রাখে। সেই সঙ্গে এই আইনি অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে জনসচেতনতা কতটুকু বেড়েছে তাও বিবেচনায় আনা দরকার। এ প্রেক্ষিতে ব্লাস্ট ৭টি মহানগরের এই ধারাগুলোর অপপ্রয়োগের শিকার ব্যক্তি, পুলিশ কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট, আইনজীবী ও নাগরিক সমাজের সদস্যদের কাছ থেকে তথ্য ও মতামতের ভিত্তিতে গবেষণা সমীক্ষাটি পরিচালনা করেছে।

১.১ গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশে পুলিশ ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারার প্রয়োগের বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালতের রায় ও নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও পুলিশের বিরুদ্ধে এসকল ধারার অপপ্রয়োগের অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন শাসনামলে দেখা গেছে পুলিশ ৫৪ ধারা বলে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৩ ধারায় নিবর্তনমূলক আটকের আদেশ প্রদান করে। আবার অনেক সময়ই দেখা যায় পুলিশ গ্রেফতারের সময় পরিচয়পত্র দেখায় না, গ্রেফতারের কারণ জানায় না এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারের সঙ্গে ও আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেয়না। পুলিশের বিরুদ্ধে বন্দিদের প্রতি খারাপ আচরণ ও নির্যাতনের অভিযোগও রয়েছে। নানা সময়ে অনেককেই গ্রেফতার করে উৎকোচ নেয়। সেটি গ্রেফতার বাণিজ্য বলে বহুল আলোচিত।

লক্ষণীয় যে, পুলিশের এধরনের স্বেচ্ছাচারিতা মোকাবেলা করার ক্ষমতা ধণাঢ্য ও প্রভাবশালীদের থাকলেও গরিব জনগণের তা নেই। ফলে গরিব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠিই এর নির্মম শিকার। দুর্ভাগ্যজনক যে, ২০০৩ সালে এ সংক্রান্ত হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ি সরকার আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ২০০৪ সালে সরকার বিরোধী আন্দোলনে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ ১৯৭৬-এর ৮৬ ও ১০০ ধারায় আওতায় ব্যাপক ভাবে ধরপাকড় করে। এই গণহারে গ্রেফতারের বিরুদ্ধেও ব্লাস্টসহ অন্যান্য মানবাধিকার সংগঠন রিট পিটিশন দায়ের করে[৪] যা আদালতে এখনও বিচারাধীন রয়েছে।

এ পরিস্থিতিতে আটক ও রিমান্ড সংক্রান্ত উচ্চ আদালতের রায় ও নির্দেশনা বাস্তবায়নে আইনগত ও বিচারিক কি কি উন্নয়ন হয়েছে বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা পরীক্ষা করার জন্য এই গ্রবেষণা সমীক্ষাটি পরিচালনা করা হয়েছে। এতে ফৌজদারী কার্যবিধি ছাড়াও অন্যান্য আইনে পরোয়ানা ব্যাতিত আটকের ক্ষেত্রে পুলিশের ক্ষমতার নতুন নতুন দিক বা কৌশল খোজার চেষ্টা করা হয়েছে।

ব্লাস্ট এই গবেষণা সমীক্ষা পরিচালিত করেছে আটক ও রিমান্ড সংক্রান্ত আদালতের রায়ের প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য।

৪ রীট পিটিশন নং ২১৯২/২০০৪

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণা সমীক্ষার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে;

ক. ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা সংক্রান্ত ২০০৩ সালে হাইকোর্টের রায়ের পর তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্র ও পরিধি নিয়ে পর্যালোচনা;

খ. হাইকোর্টের রায়ের পর সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালা সংস্কারে এবং হাইকোর্ট প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ খতিয়ে দেখা;

গ. ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ ব্যতীত অন্যান্য আইনে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতারের ক্ষেত্র ও পরিধি খতিয়ে দেখা; এবং

ঘ. রায়ের কার্যকর প্রয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট আইন, নীতিমালা ও পদ্ধতি সংস্কারের জন্য তা সুপারিশ করা;

১.৩ গবেষণার পদ্ধতি

এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী উভয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সেকেন্ডারী তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের রায়, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাতটি মহানগর এলাকায় সংশ্লিষ্ট নাগরিক সমাজের সদস্য, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি বা তাদের পরিবারের সদস্য, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এবং বিচারিক কর্মকর্তাদের নিয়ে মোট ২২৭ জন উত্তরদাতার নিকট থেকে আধা-কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, উত্তরদাতা আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা ও বিচারিক কর্মকর্তাগণ বেআইনী আটক ও রিমান্ড সম্পর্কে সাক্ষাৎকার প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করেন। গবেষণার উদ্দেশ্য অনুধাবন করার পর পরিচয় গোপন রাখার শর্তে সাক্ষাৎকার প্রদানে রাজী হন। প্রাইমারী তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিন ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে তা হলো:

ক. আধা-কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ

খ. দলগত আলোচনা

গ. বিস্তৃত সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

ক. আধা-কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার

মোট ১৫৪ জন উত্তরদাতার কাছ থেকে আধা-কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি মহানগর থেকে ৮ জন নাগরিক সমাজের সদস্য, ৮ জন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি বা তাদের পরিবারের সদস্য ও ৬ জন সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

খ. দলগত আলোচনা

প্রত্যেক মহানগর থেকে একটি করে মোট সাতটি দলগত আলোচনা পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতিটি দলগত আলোচনায় ৬-৮ জন করে মোট ৪৮ জন উত্তরদাতা অংশগ্রহণ করে। দলগত আলোচনা-তে উপস্থিত ছিলেন নাগরিক সমাজের সদস্য এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি বা তাদের পরিবারের সদস্য।

গ. বিস্তৃত সাক্ষাৎকার

প্রত্যেক মহানগর থেকে তিনটি করে মোট ২১টি বিস্তৃত সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৬ জন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি, ৬ জন নাগরিক সমাজের সদস্য, ৯ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা রয়েছেন। এর অতিরিক্ত ঢাকা মহানগর থেকে ৫ জন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর বিস্তৃত সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মোট ২৬ জন উত্তরদাতার বিস্তৃত সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

১.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

সাতটি মহানগরে এই সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়েছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমীক্ষাটি পরিচালনা করা যায়নি। সারাদেশের মহানগর, জেলা ও উপজেলায় ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা প্রয়োগের মাধ্যমে পুলিশ বিনা পরোয়ানায় সন্দেহবশত: গ্রেফতার এবং রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তবে মহানগর এলাকায় ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারার পাশাপাশি মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ করেও পুলিশ বিনা পরোয়ানায় সন্দেহবশত: গ্রেফতার করে।

এই গবেষণা সমীক্ষাটি পরিচালনায় মহানগর গুলোকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়েছে তাহলো, মহানগরগুলোতে রাজনৈতিক তৎপরতা ও অপরাধ প্রবণতা বেশি। ফলে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতারও হয় বেশি। তাই বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার ও জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে শহরবাসী বেশি অবহিত।

গ্রেফতার ও রিমান্ড সম্পর্কিত আইন ও হাইকোর্টের নির্দেশনা

২.১ গ্রেফতার ও রিমান্ড সম্পর্কিত আইন

ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার সম্পর্কে বিধান রয়েছে। এই ধারা অনুযায়ী পুলিশ কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বা গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়া নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে গ্রেফতার করতে পারে;

ক. কোন আমলযোগ্য অপরাধের সাথে জড়িত বা কারো বিরুদ্ধে আমলযোগ্য অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ করা হয়েছে বা বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া গেছে বা যুক্তিসংগত সন্দেহ রয়েছে এমন কোন ব্যক্তি;

খ. আইনসংগত কারণ ব্যতিত ঘর ভাঙ্গার কোনো সরঞ্জাম বহনকারী ব্যক্তি;

গ. আইন অনুযায়ী অপরাধী ঘোষিত ব্যক্তি;

ঘ. চোরাই মাল বহন বা সন্দেহ করা হচ্ছে এরূপ চোরাই মাল সম্পর্কিত কোন অপরাধী ব্যক্তি;

ঙ. পুলিশ অফিসারের দায়িত্ব পালনে বাধা দানকারী ব্যক্তি অথবা আইনসঙ্গত হেফাজত হতে পালিয়েছে বা পালানোর চেষ্টা করেছে এমন ব্যক্তি;

চ. বাংলাদেশের কোনো সশস্ত্র বাহিনী থেকে পালিয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে এমন ব্যক্তি;

ছ. অন্য কোন পুলিশ অফিসারের নিকট থেকে গ্রেফতারের জন্য অনুরোধকৃত ব্যক্তি (তবে অনুরোধপত্রে গ্রেফতারের কারণ বা আনীত অভিযোগ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে);

জ. যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ বাংলাদেশের বাইরে করেছে যা বাংলাদেশে করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হত;

ঝ. কোনো সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে মুক্তির পর তার বাসস্থান পরিবর্তন বা বাসস্থানে অনুপস্থিতি সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

আবার ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৫ ধারায় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তিন শ্রেণীর ব্যক্তিকে যুক্তিসংগতভাবে সন্দেহ হলে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারেন বা অন্যকে গ্রেফতারের আদেশ দিতে পারেন। তারা হলেন,

ক. এখতিয়ারাধীন এলাকায় এসে গুরুত্বর অপরাধ করার জন্য আত্মগোপনকারী;

খ. যার ভরণপোষণের জন্য প্রকাশ্য কোন জীবিকা নেই

গ. চোর বা ডাকাত রূপে পরিচিত কোন ব্যক্তি।

বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির বিষয়ে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ফৌজদারী কার্যবিধির ৬০ ও ৬১ ধারায় বলা হয়েছে। ৬০ ধারা অনুযায়ী বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব না করে এখতিয়ার সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট বা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট নিতে হবে। ৬১ ধারায় বলা হয়েছে, ১৬৭ ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ আদেশ না থাকলে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘন্টার বেশী আটক রাখা যাবে না।

আবার ২৪ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত শেষ না হলে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে কার্যবিধির ১৬৭ ধারায় বিধান রয়েছে। ১৬৭ ধারার ১ উপ-ধারায় বিধান মতে, হেফাজতে আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ২৪ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করা যাবে না মর্মে প্রতীয়মান হলে এবং যদি প্রাপ্ত অভিযোগ বা সংবাদ যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হয়, তাহলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তদন্তকারী কর্মকর্তা অতি দ্রুত কেস ডাইরীতে লিখিত ঘটনা সম্পর্কিত তথ্যের নকলসহ আসামীকে নিকটস্থ বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করবেন। উপ-ধারা ২ মতে, আসামীকে যে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট মামলার তার বিচার করার এখতিয়ার থাকুক বা থাকুক, তিনি নিজ বিবেচনায় আসামীকে বিভিন্ন সময়ে হেফাজতে আটক রাখার ক্ষমতা প্রদান করবেন, তবে তা সর্বোচ্চ ১৫ দিনের বেশী হবে না। আবার উপ-ধারা ৩-এ বলা হয়েছে, আসামীকে পুলিশ হেফাজতে আটক রাখার ক্ষমতা প্রদানকারী ম্যাজিস্ট্রেট তার এরূপ আদেশের কারণ লিখে রাখবেন। এভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তদন্তের স্বার্থে ২৪ ঘন্টার অতিরিক্ত পুলিশ হেফাজতে আটক রাখার বিষয়কে সাধারণভাবে বাংলাদেশের ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় 'রিমান্ড' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এটি অনুমেয় যে, পুলিশ কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের পর প্রথম ২৪ ঘন্টার মধ্যে ঘটনার সাথে অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পৃক্ততার তথ্য উদঘাটন করবেন।

২.২ ব্লাস্ট ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ ও অন্যান্য মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশনাসমূহ

ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় বিনা পরোয়ানায় কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের ক্ষেত্রে পুলিশকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এই ধারায় ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার ও আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া খর্ব হয়। আবার কার্যবিধির ১৬৭ ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে রাখার ক্ষমতাকে অপব্যবহারের ফলে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার, নির্যাতন এবং নিষ্ঠুর ও অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর সাজা থেকে মুক্ত থাকার অধিকার, ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার এমনকি জীবনের ধারণের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।

ব্লাস্ট ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ ও অন্যান্য[৫] মামলার আবেদনকারীগণ ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারার অধীনে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ এবং ১৬৭ ধারার আওতায় অযৌক্তিক রিমান্ড প্রতিরোধ করার জন্য নির্দেশনা চেয়েছেন। পাশাপাশি সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৫ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত রক্ষাকবচ এবং আইনে প্রতিষ্ঠিত সীমার মধ্যে যেন পুলিশ গ্রেফতার ও তদন্তের ক্ষমতা প্রয়োগ করে তার জন্যও নির্দেশনা চেয়েছেন। কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা সংবিধানের সাথে কিছুটা সামঞ্জস্যহীন এবং তা সংশোধনের প্রয়োজন বলে মহামান্য হাইকোর্ট মত দিয়েছেন। এই অসামঞ্জস্যতা দূর করার জন্য হাইকোর্ট সাত দফা সুপারিশ প্রদান করেছেন এবং সরকারকে আইন সংশোধন করে ছয় মাসের মধ্যে তা দূর করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কিছু কিছু সুপারিশ সংশ্লিষ্ট আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন ব্যতীত প্রয়োগ করা যাবে না। তবে আদালত এটা স্পষ্ট করেছেন যে, ৫৪ ধারার অধীনে গ্রেফতার এবং ১৬৭ ধারার অধীনে রিমান্ডের ক্ষেত্রে পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবিলম্বে ১৫ টি নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। এই **নির্দেশনাগুলো হলোঃ**

১. ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে ডিটেনশন বা আটকাদেশ দেয়ার জন্য পুলিশ কাউকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করতে পারবেন না।

২. কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের সময় পুলিশ অফিসার তাঁর পরিচয় প্রদান করবেন এবং প্রয়োজনে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিসহ উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিকেও তার পরিচয়পত্র দেখাবেন।

৩. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে থানায় আনার পর সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার দ্রুত গ্রেফতারের কারণসমূহ থানার রাখা কেস ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করবেন। যেমন-আমলযোগ্য অপরাধের সঙ্গে সম্পৃক্ততার তথ্য; অপরাধের বিস্তারিত বিবরণ; যে পরিস্থিতিতে গ্রেফতার করা হয়েছে; তথ্যের উৎস এবং তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতার কারণ; স্থানের বর্ণনা, সময় ও গ্রেফতারের সময় ও তারিখ এবং গ্রেফতারের সময় উপস্থিত ব্যক্তিগণের নাম ঠিকানা।

৪. যদি গ্রেফতারের সময় পুলিশ অফিসার গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন দেখতে পান তাহলে তিনি আঘাতের কারণ লিখবেন এবং তাকে চিকিৎসার জন্য নিকটস্থ হাসপাতাল বা সরকারি চিকিৎসকের কাছে নিবেন এবং চিকিৎসা প্রদানকারী ডাক্তারের সনদ নিবেন।

৫. থানায় আনার তিন ঘন্টার মধ্যে পুলিশ অফিসার গ্রেফতারকৃতকে গ্রেফতারের কারণ জানাবেন।

৬. বাসস্থান বা কর্মস্থল ছাড়া অন্য কোন স্থান থেকে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হলে, গ্রেফতারকৃতকে থানায় আনার এক ঘন্টার মধ্যে পুলিশ তার আত্মীয়-স্বজনকে টেলিফোনে বা বিশেষ বার্তাবাহক মারফত গ্রেফতারের সংবাদটি জানাবেন।

৫ ৫৫ ডিএলআর (এইচসিডি)(২০০৩) ৩৬৩ (http://blast.org.bd/component/content/article/55-cj/214-3806of1998)

৭. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী পুলিশ গ্রেফতারকৃতকে তার পছন্দমত আইনজীবী বা নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে বা দেখা করতে দিবেন।

৮. পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদনসহ নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করবেন। তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে না পারলে পুলিশ কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭(১) ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত ফরোয়াডিং-এ ২৪ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত শেষ করতে না পারার কারণ এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বা তথ্য কেন সঠিক তা বর্ণনা করবেন। একই সঙ্গে পুলিশ কর্মকর্তা এ সংক্রান্ত মামলার ডাইরী সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থাপন করবেন।

৯. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থাপনের সাথে প্রদত্ত ফরোয়াডিং এবং মামলার ডাইরীতে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বা তথ্যের যথার্থতা সম্পর্কে বর্ণিত কারণসমূহ বিবেচনা করে ম্যাজিস্ট্রেট যদি সন্তুষ্ট হন যে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির আটকের কারণ সুদৃঢ় তাহলে তিনি গ্রেফতারকৃতকে কারাগারে আটকের নির্দেশ দিবেন। অন্যথায় তাকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিবেন।

১০. আদালতে প্রদত্ত ফরোয়াডিং-এ গ্রেফতারকৃত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বা তথ্যের যথার্থতা সম্পর্কে বর্ণিত কারণসমূহ সুদৃঢ় না হওয়ায় এবং মামলার ডাইরীতে কোন উপাদান না পাওয়ায় যদি ম্যাজিস্ট্রেট তাকে মুক্তি দেন, তাহলে তিনি (ম্যাজিস্ট্রেট) বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতারকারী পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ২২০ ধারায় অপরাধ করার জন্য ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯০(১) (সি) ধারা অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১১. যদি গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ প্রদান করেন, তাহলে তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তের প্রয়োজনে এক পাশে কাঁচের দেওয়াল ও গ্রীল দিয়ে বিশেষভাবে নির্মিত কক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন যাতে করে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়-স্বজন বা আইনজীবী জিজ্ঞাসাবাদের দৃশ্যটি দেখতে পারলেও জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়টি শুনতে না পারেন।

১২. যদি তদন্তকারী কর্মকর্তা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করেন তাহলে তিনি উক্ত আবেদনে তার বিস্তারিত কারণ লিপিবদ্ধ করবেন এবং কেস ডাইরী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থাপন করবেন। অভিযোগকারীকে পুলিশ হেফাজতে প্রেরণের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্ট হলে তিনি কারণ লিপিবদ্ধ করে সর্বোচ্চ তিন দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে দেওয়ার অনুমোদন দিতে পারবেন।

১৩. যদি গ্রেফতারকৃতকে পুলিশ হেফাজতে প্রেরণের ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অনুমোদন পায় তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে তদন্তকারী কর্মকর্তার হেফাজতে নেওয়ার পূর্বে অবশ্যই দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারী ডাক্তার

বা মেডিকেল বোর্ড দ্বারা ডাক্তারী পরীক্ষা করবেন এবং ডাক্তারী পরীক্ষার প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দাখিল করবেন। কেবলমাত্র তদন্তকারী কর্মকর্তা তাকে হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন এবং জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি হেফাজতে নির্যাতনের অভিযোগ করেন তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে তৎক্ষনাৎ পূর্বের ডাক্তার বা মেডিকেল বোর্ডের কাছে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করবেন। ডাক্তার বা মেডিকেল বোর্ডের প্রতিবেদনে পুলিশ হেফাজতে আটককৃত ব্যক্তিকে নির্যাতনের বা জখমের প্রমান পাওয়া গেলে ম্যাজিস্ট্রেট, হেফাজতে আটককৃত ব্যক্তি কর্তৃক অভিযোগের দরখাস্ত ছাড়াই, দণ্ডবিধির ৩৩০ ধারায় অপরাধের কারণে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯০(১)(সি) ধারায় সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৪. যদি থানা বা পুলিশ হেফাজত বা জেলখানায় আটক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে তবে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা হেফাজতে নেয়া তদন্তকারী কর্মকর্তা বা জেলখানার জেলার এই মৃত্যুর খবর নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাবেন।

১৫. পুলিশ হেফাজতে বা জেলে কোন মৃত্যুর সংবাদ পাবার পর ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত করার জন্য অবশ্যই অতি দ্রুত ঘটনাস্থলে যাবেন এবং কোন ধরনের অস্ত্রে বা কিভাবে শরীরে ক্ষত হয়েছে তা উল্লেখ করে মৃত্যুর কারণের প্রতিবেদন তৈরী করবেন পাশাপাশি মৃত ব্যক্তির ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করবেন।

ব্লাস্ট ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ ও অন্যান্য মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশনাসমুহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে কয়েকটি পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। পর্যায়গুলো হচ্ছে; বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার ও গ্রেফতারের কারণ অবহিত করা, গ্রেফতারের সময় ও পরে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির অধিকার, রিমান্ডের আগে ও পরে আটককৃত ব্যক্তির অধিকার এবং হাইকোর্টের নির্দেশনা সম্পর্কে সচেতনতা।

হাইকোর্টের নির্দেশনা বাস্তবায়ন: মূল পর্যবেক্ষণসমূহ

৩.১ বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার ও গ্রেফতারের কারণ অবহিত করা

হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়ে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার ও গ্রেফতারের কারণ অবহিতকরণ সম্পর্কিত নির্দেশনাসমূহঃ

১. ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে ডিটেনশন বা আটকাদেশ দেয়ার জন্য পুলিশ কাউকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করতে পারবেন না।

২. কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের সময় পুলিশ অফিসার তাঁর পরিচয় প্রদান করবেন এবং প্রয়োজনে তার পরিচয়পত্র দেখাবেন।

৩. গ্রেফতারের কারণসহ বিস্তারিত তথ্য থানার রাখা ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করবেন।

৪. থানায় আনার তিন ঘন্টার মধ্যে পুলিশ অফিসার গ্রেফতারকৃতকে গ্রেফতারের কারণ জানাবেন।

৫. বাসস্থান বা কর্মস্থল ছাড়া অন্য কোন স্থান থেকে গ্রেফতার করা হলে, থানায় আনার এক ঘন্টার মধ্যে পুলিশ তার আত্মীয়-স্বজনকে টেলিফোনে বা বিশেষ বার্তাবাহক মারফত গ্রেফতারের সংবাদটি জানাবেন।

৩.১.১ বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার

ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় বর্ণিত পরিস্থিতিতে পুলিশ যুক্তিসংগত সন্দেহের ভিত্তিতে যে কোন ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারে। যদিও যুক্তিসংগত সন্দেহ'-এর কোন ব্যাখ্যা নেই। ফলে পুলিশ এই ধারায় কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রনহীন' (unfetterd) ক্ষমতা প্রয়োগ করে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষমতার অপব্যবহার হয়ে থাকে। ক্ষমতার অপব্যবহার সবচেয়ে বেশী দেখা যায় যখন কোন ব্যক্তিকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৩ ধারায় নিবর্তনমূলক আটক (preventive detention) আদেশ প্রদান করা হয়। মহামান্য হাইকোর্টের ১৫ নির্দেশনার মধ্যে প্রথম নির্দেশনা ছিল, কাউকে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৩ ধারায় নিবর্তনমূলক আটক আদেশ প্রদানের জন্য ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করা যাবে না।

এ প্রসঙ্গে উত্তরদাতা আইনজীবী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য ও বিচারিক কর্মকর্তাদেরকে সাথে বিস্তৃত সাক্ষাতকারের সার সংক্ষেপ হচ্ছে, কোন এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলে বা রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিলে বা সরকার পরিবর্তনের সময় হলে বা জরুরি অবস্থাকালে সারাদেশে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার বৃদ্ধি পায়। আবার অনেক সময় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ এলেও বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে হয়। প্রায় সকল উত্তরদাতাই মত প্রদান করেন যে, হাইকোর্টের রায়ের পর

১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৩ ধারায় নিবর্তনমূলক আটকআদেশ প্রদানের জন্য ৫৪ ধারার আওতায় বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার অনেক কমে গেছে। অনেকে এই ধরনের গ্রেফতার একেবারে শুন্যের কোঠায় বলে মত দিয়েছেন। তবে উত্তরদাতা ম্যাজিস্ট্রেট ও আইনজীবীগণ সকলেই মত প্রদান করেন যে, ৫৪ ধারায় আওতায় পুলিশ ডিটেশন দেওয়ার জন্য গ্রেফতার কম করলেও পুলিশ অন্যান্য কৌশল অবলম্বন করে নাগরিকদেরকে হয়রানী করছে। তারমধ্যে অন্যতম কৌশল হচ্ছে, যে কাউকে ৫৪ ধারা বা অন্যকোন আইন বা মামলায় গ্রেফতার করে একই থানার বা অন্য কোন থানার চলমান (pending) কোন মামলার আসামী হিসেবে গ্রেফতার দেখানো হয়, যা বাংলাদেশ ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় 'শৌন এরেস্ট' (shown arrest) নামে পরিচিত। প্রসঙ্গতঃ একটি বহুল আলোচিত মামলার উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি মোশরেফা মিশু কে সাদা পোশাকধারী ১২ জন ডিবি পুলিশ বিগত ১৪.১২.২০১০ তারিখ রাত ১২.৪৫ থেকে ২.০০ টার মধ্যে তার বাড়ি থেকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করে। পরদিন তাকে আদালতে হাজির করে কাফরুল থানার দুটি (৭৬/৩০.০৬.২০১০ ও ২১/০৯.১২.২০১০) এবং খিলক্ষেত থানার একটি (১৩/১৩.১২.২০১০) মামলায় 'শৌন এরেস্ট' দেখানো হয় যার একটি মামলা ছয় মাস আগে (৩০.০৬.২০১০) দায়ের করা হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, কোন মামলার এজাহারে অভিযুক্ত আসামী হিসেবে তার নাম ছিল না।[৬]

বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতারের ক্ষেত্রে পুলিশ আরো একটি অন্যতম কৌশল অবলম্বন করে, আর তা হলো মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশের প্রয়োগ। হাইকোর্টের নির্দেশনার পর ২০০৩ ও ২০০৪ সালে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার অনেক কমলেও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশের ৮৬ ও ১০০ ধারায় গ্রেফতার বেড়ে যায়। ২০০৪ সালের জানুয়ারী থেকে আগষ্ট পর্যন্ত ঢাকা মহানগরে মোট ৬২,৬১৩ জন গ্রেফতার হয় তার মধ্যে ৩৯,৬৮৯ জন গ্রেফতার হয় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশের ৮৬ ও ১০০ ধারায় এবং ৪,১২৯ জন গ্রেফতার হয় ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায়।[৭]

৩.১.২ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদেরকে গ্রেফতারের কারণ অবহিতকরণ

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি বা তাদের পরিবারের সদস্য মোট ৫৬ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। অধিকাংশ উত্তরদাতা (৩৪ জন) গ্রেফতারের সময়ে গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না এবং ২১ জন তাদের গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। অন্যদিকে ১ জন উত্তরদাতা গ্রেফতারকৃত

৬ Criminal Miscellaneous Case No. 10058 of 2011, Moshrefa Mishu Vs. The State (on file).

৭ Momtaz, Suraya (November 2013). "Human Rights Violations in Bangladesh: A Study of the Violations by the Law Enforcing Agencies." Mediterranean Journal of Social Science 4:13

ব্যক্তি উত্তর দানে অস্বীকৃতি জানান। গ্রেফতারের কারণ না বলার ক্ষেত্রে অনেকেই জানিয়েছেন পুলিশ তাদের প্রশ্ন আমলেই নেননি বা ব্যস্ততার ভান করে এড়িয়ে গেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ বলেছে থানায় গেলে জানতে পারবেন এমনকি ঊর্ধ্বতন মহলের নির্দেশ আছে বলে অনেককে জানিয়েছেন। উত্তরদাতাদের ১০ জন গ্রেফতারের কারণ জিজ্ঞাসা করার সাহসই পাননি। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদেরকে সুনির্দিষ্ট করে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, পুলিশ গ্রেফতারের তিন ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারের কারণ অবহিত করেছে কিনা। এ প্রশ্নের জবাবে ৩৪ জন উত্তরদাতা বলেছেন যে তাদেরকে তিন ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতারের কারণ জানানো হয়নি আর ২১ জন বলেছেন জানানো হয়েছে। যারা গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন তাদের কাছে পুণরায় জানতে চাওয়া হয় যে, তাদের কেন গ্রেফতার করা হয়েছিল? এর উত্তরে জানা যায়, ৪ জন চুরি, ১ জন চুরির সহযোগিতা, ১১ জন পূর্বতন মামলা, ২ জন রাজনৈতিক মামলা, ১ জন রাজনৈতিক দলের মিছিলে যোগদান এবং ৩ জনকে অস্ত্র মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

এ বিষয়ে নাগরিক সমাজের সদস্যদের প্রশ্ন করা হয় যে, পুলিশকে গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে কি ধরনের উত্তর দেন? নাগরিক সমাজের সদস্যদের ৩৯ জন উত্তরদাতা বলেন পুলিশ উত্তর দেয়ার প্রয়োজন মনে করেন না, অবশিষ্ট উত্তরদাতারা মনে করেন, পুলিশ ব্যস্ততা দেখিয়ে জবাব দানে বিরত থাকেন বা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হুকুম আছে বা থানা বা কোর্ট-এ গেলে জানতে পারবেন বলে এড়িয়ে যান ।

অন্যদিকে যখন আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের প্রশ্ন করা হলো বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির কাছে গ্রেফতারের কারণ তুলে ধরেন কিনা। তখন তাদের ১৮ জন বলেছেন যে তারা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের কারণ জানান আর ৯ জন বলেছেন তারা গ্রেফতারের কারণ জানান না।

দলগত আলোচনায় এ প্রসঙ্গে বেশীরভাগ উত্তরদাতা নাগরিক সমাজের সদস্য বলেন যে, পুলিশ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের কারণ বলেন না এবং জিজ্ঞাসা করার সুযোগও দেন না। হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী থানায় আনার তিন ঘন্টার মধ্যে তাকে গ্রেফতারের কারণ সবিস্তারে বলার বিষয়টি কদাচিৎ ঘটে থাকে। একজন ভিকটিমের বাবা (যিনি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান) বলেন, "আমার ছেলে ও তার দুই বন্ধুকে অন্য এক ইউনিয়ন থেকে গ্রেফতার করে। এটি আমার ও আমার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। পুলিশ গ্রেপ্তারের পর স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে হাইজ্যাকার বলে উল্লেখ করে এবং জনগণের কাছে তুলে দেয়। এতে তারা নির্মমভাবে প্রহৃত হয়। তারপর পুলিশ এসে আমার ছেলে ও দুই বন্ধুকে গ্রেফতার করে"।

অন্যদিকে বিস্তৃত সাক্ষাৎকারে বেশীর ভাগ আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা বলেন যে, তারা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের গ্রেফতারের কারণ সবিস্তারে বলেন, কিন্তু কখনো কখনো নানা কারণে নির্দিষ্টকৃত তিন ঘন্টার

মধ্যে তা করতে পারেন না। তারা অবশ্য নানা কারণের ব্যাখ্যা দেন নি। কয়েকজন বিচারিক কর্মকর্তা স্বীকার করেন যে, বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির কাছে পুলিশ গ্রেফতারকালে কারণ বলেন না। এর কারণ হতে পারে তদন্তের স্বার্থে কারণ উল্লেখ করেন না। কিংবা রাজনৈতিক কারণেও বলেন না। আবার সন্দেহজনক অপরাধ গোপন রাখা হয় যাতে গ্রেফতারকৃত সহযোগীরা আগেই সজাগ না হতে পারে। বিচারিক কর্মকর্তা বলেন যে, গ্রেফতারকৃতকে কারণ না জানানোর ক্ষেত্রে পুলিশের নিজস্ব কিছু কারণ থাকতে পারে। কিংবা তিন ঘন্টার মধ্যে ব্যাখ্যা করার ব্যাপারটি পুলিশের মধ্যে অনুসরণীয় হয়ে ওঠেনি। একসঙ্গে অনেক লোক গ্রেফতার হলে তাৎক্ষণিকভাবে কারণ জানানো সম্ভব হয় না। যাইহোক, খুব স্বল্পসংখ্যক বিচারিক কর্মকর্তা বলেন যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রেফতারের কারণ না জানানোর ক্ষেত্রে কোনো অজুহাত চলতে পারে না। এবং এটি অবহিত না করা ক্ষমতার অপব্যবহার, পুলিশ যা নিয়মিতই করে চলছেন। অপরদিকে বিস্তৃত সাক্ষাৎকারে আইনজীবীগণ মত দেন যে, খুব কম ক্ষেত্রে পুলিশ গ্রেফতারের কারণ বলে থাকেন, সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে পুলিশ গ্রেফতারের কারণ অবহিত করে থাকেন।

৩.১.৩ গ্রেফতারকালে পরিবারের সদস্য বা স্বজনদের অবহিতকরণ

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকাংশের (৪৮ জন) বক্তব্য হচ্ছে তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ দেয়া হয়নি এবং তাদের পরিবারকে গ্রেফতারের ব্যাপারে পুলিশ অবহিত করেনি। তবে তাদের পরিবারের সদস্যরা নানাভাবে তা জানতে পেরেছিল। যেমনঃ কেউ মোবাইল ফোনে জানিয়েছে (১১ জনের বক্তব্য), পরিচিত লোক কিংবা পুলিশে চাকরি করেন–এমন পরিবারের সদস্য মারফত (১২ জন),বাড়ি থেকে গ্রেফতার হয়েছেন (৩ জন), সংবাদপত্রের মাধ্যমে (১ জন), রাজনৈতিক সহকর্মীদের মাধ্যমে (২ জন) ।এর একদম বিপরীতে উত্তরদাতা পুলিশ কর্মকর্তাদের অধিকাংশই (২৫ জন) বলেন যে, গ্রেফতারের পর পর গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির পরিবারকে মোবাইল ফোন বা অন্য উপায়ে খবর দেন। অবশিষ্ট ৩ জন উত্তরদাতা বলেন যে, খবর দেন না, তাদের সেই ধরনের ব্যবস্থা নেই।

এফজিডি ও বিস্তৃত সাক্ষাতকারে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি বা তাদের পরিবারের সদস্য ও নাগরিক সমাজের সদস্যগণ ব্যাখ্যা করেন যে, পুলিশ কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের পর হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী আটক ব্যক্তির পরিবার বা স্বজনদের খবর দেয় না। তবে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যগণ অন্যান্য উৎস যেমন, গ্রেফতারের সময়ে ঐ স্থানে উপস্থিত ব্যক্তিগণ, থানায় অন্যান্য পরিচিত ব্যক্তি বা রাজনৈতিক সহকর্মীসহ অন্যান্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্রেফতারের খবর পেয়ে থাকে। বিস্তৃত সাক্ষাতকারে আইনজীবীগণও মতামত প্রদান করেন যে, পুলিশ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের গ্রেফতারের খবর দেয় না, তবে পরিবারের সদস্যগণ অন্যান্য উৎসের মাধ্যমে খবর পেয়ে থাকে।

৩.২ গ্রেফতারের সময় ও পরে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির অধিকার

হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়ে গ্রেফতারের সময় ও পরে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কিত নির্দেশনাসমূহঃ

১. গ্রেফতারের সময় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেলে আঘাতের কারণ লিখা এবং তাকে চিকিৎসার জন্য নিকটস্থ হাসপাতাল বা সরকারি চিকিৎসকের কাছে নিয়ে ডাক্তারের সনদ নেওয়া।

২. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির পছন্দমত আইনজীবী বা নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে বা দেখা করতে দেওয়া।

৩. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদনসহ নিকটতম ম্যাজিস্টেটের নিকট হাজির করা।

৪. ২৪ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত শেষ করতে না পারলে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭(১) ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত ফরোয়াডিং-এ তার কারণ এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বা তথ্য কেন সঠিক তা বর্ণনা দেয়া ।

৩.২.১ আইনজীবী ও নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে পরামর্শ

গ্রেফতারকৃত ও তাদের পরিবারের সদস্য ৫৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪৫ জন বলেছেন যে, গ্রেফতারের পর পুলিশ তাদের আত্মীয়-স্বজন বা আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করার সুযোগ দেয় নাই, পক্ষান্তরে মাত্র ১১ জন সে সুযোগ পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে নাগরিক সমাজের সদস্যদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে যে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে তার আইনজীবী বা স্বজনদের সাথে পরামর্শ করার সুযোগ প্রদানের নির্দেশ পুলিশ মেনে চলে কিনা। তাদের ৪৪ জন বলেন যে, পুলিশ তার স্বজন ও আইনজীবীকে অবহিত করেন না অন্যদিকে ১০জন বলেন যে, পুলিশ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে তার আইনজীবী বা স্বজনদের সাথে পরামর্শের সুযোগ দেন। অন্যদের মন্তব্য হলো–পুলিশ গ্রেফতারকৃতদের আত্মীয় ও বন্ধুদের প্রতি সদয় নন।

আবার বিপরীত চিত্র দেখা যায় যখন এ প্রসঙ্গে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে। বেশীরভাগ (২৪ জন) উত্তরদাতা আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাগণ বলেন যে, গ্রেফতারকৃতদের স্বজন বা আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শের সুযোগ করে দেয়া হয়। মাত্র ৪ জন উত্তরদাতা আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা বলেন যে, এমন সুযোগ দেয়া হয় না। আর ১৪ জন বিচারিক কর্মকর্তাদেরকে এর মধ্যে ৬ জনবলেন, পুলিশ তাদের আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শের সুযোগ দেয়।

অন্যদিকে বেশীর ভাগ বিস্তৃত সাক্ষাৎকারদাতা আইনজীবী ও দলগত আলোচক নাগরিক সমাজের সদস্যগণ বলেন যে, পুলিশ হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ ও নিকটতম আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দেয়না। অন্যদিকে বিস্তৃত সাক্ষাৎকারে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাগণ এ অভিযোগ অস্বীকার করেন। তবে একজন কর্মকর্তা বলেন যে, তারা তাই করেন যা তাদের উর্ধ্বতনরা করতে বলেন।

৩.২.২ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে আদালতে হাজির

গ্রেফতারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করা হয়েছিল কিনা- প্রশ্নের উত্তরে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের ৪৪ জন বলেছেন যে তাদেরকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে আদালতে হাজির করা হয়েছে আর ১২ জন বলেছেন যে, তাদেরকে গ্রেফতারের ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর আদালতে হাজির করা হয়েছিল। গ্রেফতারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির না করার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সংশ্লিষ্ট গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের কেউ কেউ বলেন যে উৎকোচ দিতে দেরি হওয়ায় তাদের আদালতে হাজির করেনি। অনেকের ক্ষেত্রে কোর্টে চালান না করেই ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব করার কারণে দেরী হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছুটির দিন হওয়ায় বিলম্ব হয়েছে। ২৪ ঘণ্টার পর আদালতে হাজির করলেও ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পুলিশ ফরোয়াডিং-এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হাজির করার কথা উল্লেখ করেছে। এ প্রসঙ্গে বেশিরভাগ নাগরিক সমাজের উত্তরদাতা অবহিত আছেন যে, গ্রেফতারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করতে হয়। তবে তারা বলেন এ বিষয়ে অনেক অভিযোগ রয়েছে যে, পুলিশ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করেন না। অন্যদিকে সকল (২৮জন) আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাই দাবি করেন যে, গ্রেফতারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে কোর্টে পাঠানো হয়। তারা সর্বদাই আইনের প্রতি অনুগত।

ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী গ্রেফতারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হাজির করবে। প্রয়োজন হলে পুন:তদন্তের স্বার্থে আবার পুলিশ হেফাজতে নেয়ার জন্য কোর্টে আবেদন করতে পারে, সেটি "রিমান্ড" বলে বহুল পরিচিত। প্রথমেই পুলিশ কোর্ট প্রদত্ত নির্ধারিত তারিখে আসামী হাজির করতে পারেনা। পুলিশ ব্যর্থ হলে আইন মোতাবেক সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেই দায়বদ্ধ। এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে বিচারিক কর্মকর্তাদের কাছে বেশ কিছু প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্ন ছিল, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হাজির করতে ব্যর্থ হলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন- এর উত্তরে বার (১২) জন বলেন যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হাজির না করতে পারার কারণ ব্যাখা করতে বলেন পুলিশকে। তবে অপর দুই জন এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানান। পরবর্তি প্রশ্নে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আটক ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করাতে পুলিশ ব্যর্থ হওয়ার কারণ হিসেবে বিচারিক কর্মকর্তাগণ প্রিজন-

ভ্যানের স্বল্পতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আটক ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করানো বা আটক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ অন্য অভিযুক্তদের সন্ধান করতে যাওয়া ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন।

বিস্তৃত সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্য এবং নাগরিক সমাজের সদস্যগণ বলেন পুলিশ অনেক ক্ষেত্রেই গ্রেফতারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে আদালতে হাজির করানোর আইনি বাধ্যবাধকতা অনুসরণ করেন না। এ প্রসঙ্গে তারা নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেন[৮];

(ক) ছুটির দিন হলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতারকৃতকে আদালতে হাজির করানো সম্ভব হয় না;

(খ) অনেক সময় পুলিশ ইচ্ছাকৃত ভাবে গ্রেফতারের ভুল সময় উল্লেখ করে এবং দেরীতে আদালতে হাজির করে;

(গ) অনেক সময় পুলিশ যানবাহনের সমস্যার কথা বলে;

(ঘ) প্রাথমিক তদন্ত করতে দেরী হচ্ছে বলে পুলিশ অজুহাত দেখায়; এবং

(ঙ) অনেক ক্ষেত্রে থানায় রেখে টাকা আদায় করে। তারা বলে যে, দাবিকৃত টাকা পেলে আদালতে পাঠানো হবে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ[৯] মামলায় দেখা যায় অভিযুক্ত শৈবাল সাহা পার্থকে সাদা পোশাকধারী পুলিশ আটকের ৪ দিন পর তাকে ধানমন্ডি থানায় উপস্থাপন করে এবং একই দিন তার বিরুদ্ধে ঐ থানায় একটি এফআইআর দাখিল করে। কোন ধরনের আইনগত কর্তৃত্ব ছাড়াই তাকে এই ৪ দিন আটক রাখা হয়েছে। আবার খুলনা থেকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি অভিযোগ করেন যে, গ্রেফতারের পর ৫ দিন অমানসিক নির্যাতনের পর তাকে আদালতে নেওয়া হয়।[১০]

অন্যদিকে, বিস্তৃত সাক্ষাৎকারে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাগণ এমন সব অভিযোগ অস্বীকার করেন। তবে ২৪ ঘন্টার মধ্যে হাজির না করার ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম ঘটনার উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে একজন কর্মকর্তা বলেন যে, ২৪ ঘন্টা গণনায় ঝামেলায় পড়তে হয়। কখনো কখনো ব্যাপারটা গুলিয়ে ফেলেন। যেমন রাত ৮ টায় কাউকে গ্রেফতার করা হলো। তদন্তের জন্য বেশী সময় লাগল। তখন আদালতে হাজির করতে দেরী হলো। আদালত ফিরিয়ে দিল। তখন আমরা তৃতীয় দিনে আদালতে হাজির করলাম। এটি সময় নিরূপনের ক্ষেত্রে এটি বড় সমস্যা। এর জন্য আদালত থেকে কৈফিয়তও চাওয়া হলো। এ ক্ষেত্রে কি করার থাকে?[১১]

---

৮ ৭টি দলগত আলোচনা এবং ১২টি বিস্তৃত সাক্ষাৎকার-এ গ্রেফতারকৃত ও রিমান্ডেনীত ব্যক্তিদের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ।

৯ ৫৬ ডি এল আর (২০০৪) ৬২০, আইন ও সালিশ কেন্দ্র ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ

১০ ২৭ নভেম্বর ভিকটিমের সাথে ব্লাস্টের সাক্ষাৎকার।

১১ ১৫ নভেম্বর, ২০১২ রাজশাহীতে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তার সাথে ব্লাস্টের সাক্ষাৎকার।

৩.২.৩ গ্রেফতারের সময় ও পরে পুলিশের আচরণ

গ্রেফতারের সময় এবং পরে পুলিশের আচরণ প্রসঙ্গে উত্তরদাতা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ (৩৭ জন) বলেছেন তাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করা হয়েছে ও নির্যাতন করা হয়েছে। অন্যদিকে নির্যাতন করা হয়নি বলে জানিয়েছেন গ্রেফতারকৃতদের এক-তৃতীয়াংশ (১৯ জন)। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের কাছে গ্রেফতারের সময় পুলিশের আচরণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। এর উত্তরে ২৩ জন উত্তরদাতা মনে করেন যে, গ্রেফতারের সময় পুলিশের ব্যবহার নির্ভর করে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির সামাজিক শ্রেণীগত অবস্থানের ওপর। অন্যদিকে ১৩ জন উত্তরদাতা মনে করেন গ্রেফতারের সময় পুলিশ সদস্যরা খারাপ আচরণ করেন, আর ১১ উত্তরদাতা বলেন পুলিশের ব্যাবহার খারাপ নয় তবে ঘুষ দাবী করেন, ঘুষ দিয়ে কিছু লোক গ্রেফতার এড়িয়ে যেতে পারে এবং ১০ জন উত্তরদাতা মনে করেন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের গালিগালাজ করা হয়। মাত্র ১ জন উত্তরদাতা মনে করেন পুলিশের ব্যবহার সম্পর্কে যে রকম বিরূপ ধারনা আছে, আসলে পুলিশ ততটা খারাপ নন। অন্যদিকে গ্রেফতারের পর নির্যাতন সম্পর্কে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। আধা-কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকার কালে ৫৪ জন নাগরিক সমাজের উত্তরদাতা বলেন, গ্রেফতারের পর পুলিশ নির্যাতন করে থাকেন। তাদের মতে নির্যাতনের ধরনগুলো হল শারীরিক নির্যাতন, খেতে না দেওয়া, মানসিক নির্যাতন, অর্থ লাভের জন্য নির্যাতন এবং নারী বন্দিদের ওপর যৌন-হয়রানি। অন্যদিকে ৭ জন উত্তরদাতা মনে করেন মামলার গুরুত্বের সঙ্গে নির্যাতনের যোগসূত্রতা রয়েছে।

এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের জিজ্ঞেস করা হয় যে, গ্রেফতারের পর নির্যাতন করা হয় কিনা? ১৯ জন উত্তরদাতা নির্যাতনের বিষয় অস্বীকার করেন। ৯ জন স্বীকার করেন যে, কখনো কখনো নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। তাদের মতে নির্যাতনের ধরণগুলো হচ্ছে –তিরস্কার করা, শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, ঘুষ আদায়।

দলগত আলোচনা ও বিস্তৃত সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যগণ অভিযোগ করেন যে, গ্রেফতারের পর তাদের উপর নানা ধরণের নির্যাতন করা হয়। এসকল নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে তিরষ্কার, দুর্ব্যবহার, শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, অর্থনৈতিক নির্যাতন অর্থাৎ উৎকোচের দাবি এবং ধর্ষণ। দলগত আলোচনার আলোচকগণ ব্যাখ্যা করেন যে, নির্যাতনের ধরণ ও মাত্রা মামলার গুরুত্বের ওপর নির্ভরশীল। একজন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন, 'সেটি ছিল ভয়ানক মানসিক নির্যাতন। পুলিশ আমাকে চারদিন ধরে নির্যাতন করে। যৌন নির্যাতন চালায়। পুলিশ আমাকে প্রহার করে না কিন্তু আমার সুনাম ক্ষুন্ন করেছে।' পুলিশী নির্যাতনের শিকার অপর একজন ব্যক্তি বলেন যে, 'গ্রেফতারের পর পুলিশ আমাকে প্রহার করেছে এবং আমার গায়ে গরম পানি ঢেলেছে।'

দলগত আলোচনা ও বিস্তৃত সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীরা বলেন যে, পুলিশ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির উপর সবকিছুই করতে পারে। যে কোন ধরণের অত্যাচার করতে পারে। অপরদিকে তারা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির সঙ্গে ভালো ব্যবহারও করতে পারে। কেমন ব্যবহার করবে তা নির্ভর করে আটক ব্যক্তির সামাজিক অবস্থা, লিঙ্গ, শ্রেণী ও রাজনৈতিক পরিচয়ের ওপর। নির্যাতনের অভিযোগ সম্পর্কে বিস্তৃত সাক্ষাৎকারদাতা আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা কয়েকভাগে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তারা বলেন যে, গ্রেফতারের সময় ও পরে তারা কোন নির্যাতন করেন না। তবে তাদের কেউ কেউ স্বীকার করেন যে, মানসিক চাপ থাকায় তারা নিজেদের সংযত রাখতে পারেন না। তাই গ্রেফতারের সময় কিছু পুলিশ কর্মকর্তা আটক ব্যক্তিকে মারধর করেন।

৩.২.৪ গ্রেফতারের সময় ও পরে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির চিকিৎসা

গ্রেফতারকৃতদের কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, গ্রেফতারের পর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল কিনা–উত্তরে ৩৪ জন বলেছেন তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং অবশিষ্টরা সুস্থ ছিলেন। চিকিৎসা সহায়তা প্রসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়াদের দেয়া তথ্যানুযায়ী - ১৯ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে, ৭ জনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে এবং ৯ জনকে অসুস্থতার জন্য কিছুই করা হয়নি। অন্যদিকে উত্তরদাতা সকল আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাগণ বলেন যে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তবে ১৪ জন উত্তরদাতা আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা বলেন, অসুস্থ হয়ে পড়ার পর কোন আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে তার বিরুদ্ধে পুলিশ বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আর ২ জন উত্তরদাতা বলেন যে, চিকিৎসার ব্যবস্থা না করা হলে বিচার বিভাগীয় তদন্ত হয়। অন্যদিকে ১২ জন উত্তরদাতা এ প্রশ্নের উত্তরে নিরব থাকেন।

এ বিষয়ে প্রায় সকল উত্তরদাতা বিচারিক কর্মকর্তা(১৩ জন) বলেন যে, পুলিশ হেফাজতে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়লে সাধারণত-পুলিশ চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। তিনজন বিচারিক কর্মকর্তা উল্লেখ করেন যে, পুলিশ হেফাজতে আটক ব্যক্তির অসুস্থতার খবর জানতে পারলে তদন্ত কর্মকর্তাকে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। জেলে বন্দি আছেন–এমন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য জেল কর্মকর্তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য নির্দেশ দেন অথবা জামিন দেন যাতে উন্নত চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারে।

বিচারিক কর্মকর্তাদেরকে পুনরায় প্রশ্ন করা হয় যে, পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে কিনা তা তারা কি করে নিশ্চিত হন। ৯ জন উত্তরদাতা বলেন যে, তারা মেডিকেল সার্টিফিকেট দেখে নিশ্চিত হয়, দুইজন জানিয়েছেন যে, তারা কোর্টে আসামীর পরবর্তী হাজিরার দিন সরাসরি কথা বলেন। একজন বলেন, কাস্টডির দায়িত্বে থাকা ব্যক্তির কাছ থেকে খোঁজ নেন। আসামী অসুস্থ হয়ে পড়ার পরেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না করা হলে তার জন্য কি ব্যবস্থা নেন। এর উত্তরে ৩ জন উত্তরদাতা বিচারিক কর্মকর্তা বলেন,

তারা যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, ৪ জন বলেন-তাদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করা হলে তারা সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা বা কারা কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেন এবং একজন জানান, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কনটেমপ্ট পিটিশন পাঠান। এছাড়া ৪ জন বিচারিক কর্মকর্তা বলেন যে, সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা নির্দেশ অমান্য করলে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে জামিন মঞ্জুর করা হয় এবং ৩ জন বিচারিক কর্মকর্তা বলেন, তারা চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবার নির্দেশ দেন।

৩.৩ রিমান্ডের আগে ও পরে আটককৃত ব্যক্তির অধিকার

মহামান্য হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়ে রিমান্ডের আগে ও পরে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কিত নির্দেশনাসমূহঃ

১. তদন্তের প্রয়োজনে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের সময় এক পাশে কাঁচের দেওয়াল ও গ্রীল দিয়ে বিশেষভাবে নির্মিত কক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ করা

২. রিমান্ড আবেদনে রিমান্ডে নেওয়ার বিস্তারিত কারণ লিপিবদ্ধ করা এবং কেস ডাইরী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থাপন করা। রিমান্ড আবেদনে ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্ট হলে কারণ লিপিবদ্ধ করে সর্বোচ্চ তিন দিনের রিমান্ডের নেওয়ার অনুমোদন দেয়া।

৩. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদেনেওয়ার পূর্বে ডাক্তারী পরীক্ষা করা এবং ডাক্তারী পরীক্ষার প্রতিবেদন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দাখিল করা। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি হেফাজতে নির্যাতনের অভিযোগ করেন তাহলে গ্রেফতারকৃতকে একই ডাক্তার বা মেডিকেল বোর্ডের কাছে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা।

৪. মেডিকেল রিপোর্টে পুলিশ হেফাজতে আটককৃত ব্যক্তিকে নির্যাতনের প্রমান পাওয়া গেলে কোন আবেদন ছাড়াই দণ্ডবিধির ৩৩০ ধারায় অপরাধের কারণে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯০(১)(সি) ধারায় সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫. থানা বা পুলিশ হেফাজত বা জেলখানায় আটক ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা হেফাজতে নেয়া তদন্তকারী কর্মকর্তা বা জেলখানার জেলার এই মৃত্যুর খবর নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেটকে জানানো।

৬. পুলিশ হেফাজতে বা জেলে কোন মৃত্যুর ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটকে অতিদ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করা এবং মৃত ব্যক্তির ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করা।

৩.৩.১ রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের সময় নির্যাতন

গ্রেফতারকৃত উত্তরদাতাগণ পুলিশ রিমান্ডে থাকাকালে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন। তাদের তথ্য অনুসারে নির্যাতনের ধরন গুলো হলো গরম পানি ঢালা, বৈদ্যুতিক শক, প্রহার, মলদ্বারে মরিচ ও ডিম ঢোকানো, হাতের নখ তুলে ফেলাসহ অন্যান্য ধরনের নির্যাতন। অন্যদিকে ১০ জন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি জানান তারা পুলিশকে ঘুষ দিয়ে নির্যাতন থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে নাগরিক সমাজের প্রত্যেক উত্তরদাতা মনে করেন রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের সময় কোন না কোন নির্যাতন হয়েই থাকে। তারা বলেন, রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের সময় প্রহার, বৈদ্যুতিক শক, গায়ে গরম পানি ঢালা, যৌন হয়রানী ইত্যাদি ধরনের নির্যাতন হয়ে থাকে। অনেকে মনে করেন ঘুষ দিলে নির্যাতন করা হয় না। আবার কেউ কেউ মনে করেন স্বীকারোক্তি আদায়ে পুলিশ যথেচ্ছা নির্যাতন করে এবং অভিযোগের রকম ভেদে নির্যাতনের মাত্রা নির্ভর করে।

রিমান্ডে থাকাকালে নির্যাতন প্রসঙ্গে পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রশ্ন করা হলে ১০ জন উত্তরদাতা বলেন যে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সুবিধা না থাকায় কিছুটা নির্যাতন করা হয়ে থাকে। তাছাড়া অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সত্য কথা বলে না। অন্যদিকে বেশীরভাগ উত্তরদাতা (১৮ জন) বলেন যে, রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালে কোন নির্যাতন করা হয় না।

বিস্তৃত সাক্ষাৎকার ও দলগত আলোচনায় অংশগ্রণকারী গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি বা তাদের পরিবারের সদস্য ও নাগরিক সমাজের সদস্যদের বেশীর ভাগই রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদকালে পুলিশ নির্যাতনের অভিযোগ করেন। বিস্তৃত সাক্ষাৎকারে ৩২ বছরের একজন পুরুষ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন–'রিমান্ডে থাকাকালে পুলিশ আমাকে কয়েকবার নির্যাতন করে। চারদিন ধরেই চালায় মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন। আমরা শুনেছিলাম, রিমান্ডে নিয়ে পুলিশ গরম ডিম ব্যবহার করে। আমার সঙ্গে তাদের ব্যবহার ছিল তার চেয়েও ভয়াবহ। তারা আমার মলদ্বারে মরিচ ঢোকায়। আমি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ি। কিন্তু পুলিশ আমার কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা করে না। জামিনের পর আমি চিকিৎসা করাই।'

ব্লাস্টের সঙ্গে দেয়া সাক্ষাৎকারে আপর একজন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেন। 'কয়েক বছর আগে আমি গ্রেফতার হয়েছিলেন। পুলিশ আমাকে গ্রেফতারের কারণ জানায়নি। কিন্তু থানায় নেওয়ার পরই পরই পুলিশ নির্যাতন শুরু করে। অস্ত্র আছে বলে তথ্য ও স্বীকারোক্তি আদায়ে জোরাজুরি করে। কোর্টে হাজির করার পর পুলিশ আবার আমাকে রিমান্ডে নেয়। এবং আরো তিন দিন ধরে পুলিশ হেফাজতে আমার ওপর অমানসিক নির্যাতন করা হয়। আমাকে ঠিকমত চিকিৎসা করানো হয় না। এবং আমাকে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, আদালতে নির্যাতনের কথা বললে আমাকে আবারও নির্যাতন করা হবে।'

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন চৌধুরী সরোয়ার জাহান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন। তিনি কোনভাবে রিমান্ড থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন, তবে তার কয়েকজন সহকর্মীকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছিল এবং নির্যাতন করা হয়েছিল। তিনি সাক্ষাতকারে বলেন, 'রিমান্ডে নিয়ে নানা রকমের নির্যাতন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তাদের পায়ের আঙ্গুলে আঘাত করা হয়েছে। বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসানো হয়েছে। তাদের ওপর এমনভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল যে, তারা হাটতেও পারতেন না। রিমান্ড থেকে যখন তাদের কোর্টে নেওয়া হয়েছে, তখন সেখান থেকে সাধারণ লোকজন সরিয়ে দেওয়া হয়ছিল - যাতে কেউ দেখতে না পারে যে, তাদেরকে কী ভয়ানক নির্যাতন করা হয়েছে।'

এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর ২০১৪/১৫ সালের প্রতিবেদনে হেফাজতে আটক ব্যক্তির প্রতি আইন শৃংখলা বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন প্রকার নির্যাতনের ধরন সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৪ সালের জানুযারী থেকে জুলাই এর মধ্যে কমপক্ষে ৯ জন ব্যক্তি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হেফাজতে মৃত্যুবরণ করেন।[১২] এই প্রতিবেদন অনুযায়ী পুলিশ যে ধরনের নির্যাতন করে তার মধ্যে প্রহার, ছাদের সাথে ঝুলিয়ে রাখা, যৌনাঙ্গে বৈদ্যুতিক শক, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আটককৃত ব্যক্তির পায়ে গুলি করা।[১৩]

৩.৩.২ রিমান্ডে আদালতের নির্দেশিত কক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ

হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী, রিমান্ডকালে এমন কক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে যে কক্ষের কমপক্ষে একপাশ কাঁচের দেয়াল এবং গ্রিল দিয়ে পরিবেষ্টিত। যাতে কক্ষের মধ্যে কী হচ্ছে তা বাইরে থেকে দেখা যায়। এই গবেষণার উত্তরদাতা গ্রেফতারকৃত ৫৬ ব্যক্তির ৩৩ জনকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। রিমান্ডে নেয়া ব্যক্তিরদের ভাষ্যমতে কোথাও হাইকোর্টের সুপারিশকৃত কাঁচের দেয়াল ঘেরা কক্ষের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করার রেওয়াজ নেই। বেশির ভাগ জিজ্ঞাসাবাদ থানায় করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত কেউ কেউ জানতেন না যে, তাদের কোথায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। আবার নাগরিক সমাজের উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, তাদের পরিচিত কোন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে রিমান্ডে নিয়ে কোথায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। উত্তরে ৩৬ জন বলেন 'থানায়' ১৫ জন বলেন 'জেল গেইট' এবং ৫ জন উত্তরদাতা মনে করেন যে পুলিশ যে কোন স্থানে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। বিস্তৃত সাক্ষাৎকার ও দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের অভিমত - থানা এবং জেলখানায় হাইকোর্টের নির্দিষ্টকৃত কাঁদের দেয়াল ঘেরা কক্ষ নেই। তবে সম্প্রতি হাইকোর্টের

১২ AsiaNews.it (March 2015). "Bangladesh police wants torture ban overturned." http://www.asianews.it/news-en/Bangladesh-police-wants-torture-ban-overturned-33687.html

১৩ Amnesty International Report 2014/15, https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/bangladesh/report-bangladesh/

নির্দেশনার প্রেক্ষিতে আদালত জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের আদেশ প্রদান করছে। তারা বলেন, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই থানায় অথবা কোন অজ্ঞাত স্থানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাই রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের সময় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির পক্ষে তার আইনজীবী বা অন্য কোন ব্যক্তির উপস্থিত থাকা দূরবর্তী স্বপ্ন। অন্যদিকে বিস্তৃত সাক্ষাৎকারে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা বলেন যে, দেশের কোন থানায় হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট কক্ষ নির্মাণ করা হয়নি। এ পরিস্থিতিতে হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুসরণের কোন সুযোগ নেই। সেটি করা হলেই পুলিশ অভিযুক্তের আত্মীয় বা আইনজীবীকে উপস্থিত থাকারও অনুমতি দিতে পারবেন। তারা বলেন, এটি বর্তমান কাঠামোগত অবস্থায় বাস্তবসম্মত নয়, কারণ জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত সব তথ্য অন্যান্যরা জেনে যাবে। তারপরও তারা স্বীকার করেন যে, হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্ভব। তবে সেই রেওয়াজ গড়ে তোলা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। বিস্তৃত সাক্ষাৎকারে বিচারিক কর্মকর্তা এবং আইনজীবীগণ ব্যাখ্যা করেন যে, রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের সময় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির আইনজীবী বা আত্মীয়ের থাকার ব্যাপারটি এখনও চালু হয়নি। তারাও আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের মতো একইরকম যুক্তি দেন। এ ছাড়াও তারা বলেন, রিমান্ডের সময় আত্মীয় বা আইনজীবীর উপস্থিত থাকার অনুমতির কোন আবেদন তারা পাননি। এমন আবেদন ব্যাপকভাবে পেলে তারা বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে ভাববেন। তাছাড়া সাধারণ মানুষও এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে অবগত নন। তারা মনে করেন যে, হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী কক্ষ এবং রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ পরিচালিত হবে কিনা – এ ব্যাপারে বিচার বিভাগ জরুরী পদক্ষেপ নিতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, হাইকোর্টের নির্দেশনার পরও সরকার অনেকগুলো জেলখানা ও মডেল থানা তৈরী করেছে। এ সকল জেলখানা ও মডেল থানায় বাজেট বরাদ্দ দিয়ে কাঁচ ও গ্রিলে ঘেরা কক্ষ তৈরী করা সম্ভব ছিল।

৩.৩.৩ রিমান্ডের আগে ও পরে মেডিকেল সার্টিফিকেট

আটককৃতকে রিমান্ডের জন্য আদালতে হাজিরের আগে এবং রিমান্ড শেষে আদালতে উপস্থাপনের সময় মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদান করেছে কিনা এমন প্রশ্ন করা হলে উত্তরদাতা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের ৩২ জন না সূচক জবাব দিয়েছেন। ৫ জন বলেছেন, এ ব্যাপারে তারা অবহিত নন।

অন্যদিকে একই প্রশ্ন উত্তরদাতা বিচারিক কর্মকর্তাদের করা হয়েছিল এবং এর উত্তরে বেশীরভাগ বিচারিক কর্মকর্তা (১১ জন) না-সুচক জবাব দেন। কেবল তিনজন বিচারিক কর্মকর্তা হ্যাঁ-সুচক উত্তর দেন।

বিচারিক কর্মকর্তাদের কাছে মেডিকেল সার্টিফিকেট না দেওয়ার কারণসমুহ জানতে চাওয়া হয়। ৪ জন বিচারিক কর্মকর্তার অভিমত, এমন চর্চা না থাকায় পুলিশ মেডিকেল সার্টিফিকেট দেয় না। একজন বিচারিক কর্মকর্তা মনে করেন যে, ব্লাস্ট এর উচিত হবে পুলিশের কাছে জানতে চাওয়া। অপর একজন কর্মকর্তা বলেন যে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি সুস্থ ও সবল থাকলে পুলিশ রিপোর্ট দেবে। আর সুস্থ ও সবল

মানে তারা দুপায়ে দাঁড়াতে ও হাঁটতে পারে। অন্য বিচারিক কর্মকর্তাগণ এ ব্যপারে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান। এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত সাক্ষাতকারে প্রত্যেক আইনজীবী জানান, তাদের পরিচালিত কোন মামলায় সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা এ পর্যন্ত রিমান্ডের আগে বা পরে কোন মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল করেননি। একজন বিশেষজ্ঞ আইনজীবী বিস্তৃত সাক্ষাতকারে জানান, তিনি তার একটি মামলায় মেডিকেল বোর্ড গঠন করার জন্য আবেদন করার পরও আদালত তা মঞ্জুর করেন নি।

৩.৩.৪ রিমান্ডের সময় আত্মীয়-স্বজন ও আইনজীবীর উপস্থিতি

শারীরিক নির্যাতনের সুযোগ রহিত করার জন্য গ্রেফতারকৃতকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়টি দূর থেকে পর্যবেক্ষনের জন্য গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন বা আইনজীবী আদালতের অনুমতি নিয়ে কাঁচ নির্মিত কক্ষের পাশে অবস্থান করতে পারবেন। এই গবেষণায় সকল উত্তরদাতা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি বলেন, কারো ক্ষেত্রেই আত্মীয়-স্বজন বা আইনজীবীকে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেয়া হয়নি।

উত্তরদাতা আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের নিকট এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন ছিল, রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন ও আইনজীবীকে উপস্থিত থাকতে দেওয়া হয় কিনা- প্রশ্নের জবাবে ৩ জন আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা হ্যাঁ সূচক মন্তব্য করেন। তবে তারা বলেন, এমন সুযোগ কেবল অপ্রাপ্ত বয়স্কদের দেওয়া হয়ে থাকে। আর ২৬ জন বলেন, রিমান্ডে জিজ্ঞসাবাদের সময়ে আত্মীয়-স্বজন ও আইনজীবীকে উপস্থিত থাকতে দেয়া হয় না। এ প্রসঙ্গে ৮ জন উত্তরদাতা বলেন, এটি করার ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে; ১৭ জন উত্তরদাতা বলেন, আইনজীবী বা স্বজনদের উপস্থিতি অপ্রয়োজনীয়; ৪ জন উত্তরদাতা জানান, কেউ রিমান্ডের সময় উপস্থিত থাকার জন্য আবেদন করেননি; ২ জন উত্তরদাতা বলেন, এটির কোন চর্চা নেই; ১ জন উত্তরদাতা বলেন, এ বিষয়ে ভাববার যথেষ্ট সময় তাদের নেই এবং ৩ জন উত্তরদাতা এ বিষয়ে কোন উত্তর দেননি।

একইভাবে বিচারিক কর্মকর্তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে যে, আসামীকে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদকালে আত্মীয়-স্বজন বা আইনজীবীকে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেন কি না – উত্তরে বেশীর ভাগ বিচারিক কর্মকর্তা (১১ জন) না-সুচক উত্তর দেন। পরবর্তীতে আবার প্রশ্ন করা হয়, তারা আত্মীয়-স্বজন বা আইনজীবীদের রিমান্ডের সময় উপস্থিত থাকার অনুমতি দেন না কেন –এর উত্তরে ৪ জন বলেন, কেউ রিমান্ডে থাকার আবেদন করেন না, ৬ জন বলেন, পুলিশ রিমান্ডের জিজ্ঞাসাবাদ দেখার জন্য কাউকে থাকতে দেয় না। একজন বিচারিক কর্মকর্তা এ প্রসঙ্গে ৪ টি কারণের উল্লেখ করেন। সেগুলো হলো, পুলিশ গোপনীয়তা রক্ষার কারণে কাউকে থাকতে দেয় না, পুলিশ ক্ষমতার অপব্যবহার করে, এ ধরনের অনুমতির কোন রেওয়াজ নেই, হাইর্কোটের নির্দেশিত কাঁচের দেয়াল ঘেরা কক্ষ নির্মিত হয়নি এবং এ কারণে আত্মীয়-স্বজন ও আইনজীবীকে জিজ্ঞাসাবাদ কালে থাকার অনুমতি দেয়া হয় না।

৩.৩.৫ ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭ ধারার প্রয়োগ বা রিমান্ড

ফৌজদারী মামলার তদন্ত ও তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে কার্যবিধির ১৬৭ ধারার প্রয়োগ বা রিমান্ডের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উত্তরদাতা বিচারিক কর্মকর্তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। অধিকাংশ বিচারিক কর্মকর্তা(১১ জন) বলেন যে, এটি আংশিক সহায়তা করে পক্ষান্তরে ৩জন বিচারিক কর্মকর্তা বলেন, তথ্য সংগ্রহে এটি অপরিহার্য। পুনরায় প্রশ্ন করা হয় ১৬৭ ধারার প্রয়োগ বা রিমান্ড কেন সহায়ক। এর উত্তরে তাদের মতামত হলো স্বীকারোক্তি আদায়, মামলার দ্রুত নিস্পত্তি, দাগী ও ধূর্ত আসামীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া, নিঃসঙ্গ অবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদে মারাত্মক সব অপরাধের আলামত ও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় বলে রিমান্ড বা ১৬৭ ধারার প্রয়োগ সহায়ক। অনুরূপভাবে প্রায় সকল উত্তরদাতা আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের মতে রিমান্ড প্রয়োজনীয়, কারণ জরুরি তথ্য বের করা, তদন্ত দ্রুত সম্পন্ন করা, মামলার দ্রুত নিস্পত্তি, দাগী অপরাধীদের কাছ থেকে তথ্য বের করা, কৌশলে জিজ্ঞাসাবাদে বড় ধরনের অপরাধীর সুত্র পাওয়া এবং অজ্ঞাত পরিচয়ের অপরাধীর প্রকৃত পরিচয় জানার জন্য। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিভিন্ন মামলায় উচ্চ আদালতের রায়ে এবং আইনজ্ঞদের মতামতে দেখা যায় ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭ ধারার বিধানসমূহ সংবিধানের মৌলিক অধিকার সাথে সাংঘর্ষিক।[১৪] 'ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭ ধারা ঔপনিবেশিক আমলের আইন যা ১৮৬০ সালে লর্ড ম্যাকুলে প্রবর্তন করেছিলেন। ঔপনিবেশিক আমলে মৌলিক অধিকারের ধারণা ছিল না। কিন্তু ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সংবিধানে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের মূলনীতিসমূহ মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এসব মৌলিক অধিকার যাতে খর্ব না হয় এবং ঔপনিবেশিক আইনের অপব্যবহার হ্রাস করার জন্যই বিচারপতি হামিদুল হক চৌধুরী আলোচ্য মামলায় (ব্লাস্ট ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ ও অন্যান্য) এই নির্দেশাবলী দিয়েছিলেন এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা সংশোধনের প্রস্তাবও দেন যাতে করে সংসদ এই বিষয়ে বিবেচনা করতে পারে। কিন্তু আমাদের প্রশাসন ও পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এখনো ঔপনিবেশিক আইনের অপব্যবহার করে যাচ্ছেন।'[১৫]

অন্যদিকে রিমান্ড মঞ্জুরের ক্ষেত্রে বিচারিক কর্মকর্তাগণ কতখানি সতর্কতা অবলম্বন করেন - প্রশ্নের জবাবে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি, গ্রেফতারকৃতদের পরিবারের সদস্য এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। বিস্তৃত সাক্ষাৎকার এবং দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে

১৪ Md. Nazmuzzaman Bhuiyan. *Police Remand: A constitutional Controversy*. 55 DLR 2003 (Journal)1

১৫ Ali, Awlad J. Network for Improved Policing in South Asia (NIPSA) (November 2014). "Review of Implementation of the High Court directions on Section 54 and 167 of Code of Criminal Procedure. http://www.nipsa.in/update/archive/review-of-implementation-of-the-high-court-directions-on-section-54-and-167-of-code-of-criminal-procedure.html

বেশীর ভাগ মনে করেন যে, আদালত রিমান্ড মঞ্জুরের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্ক নয়। তারা নিত্যদিনের কাজের মতোই রিমান্ড মঞ্জুর করেন। রিমান্ড দেওয়ার আগে তারা প্রকৃত ঘটনা খতিয়ে দেখেন না। রাজনৈতিক মামলায় রিমান্ডে নেয়াটা একটি সাধারণ প্রচলন।[১৬]

ঢাকা জেলা আদালতের একজন কর্মরত আইনজীবী বলেন, 'আমার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একটি বিষয় প্রত্যক্ষ করছি যে, রিমান্ড এখন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, এটি কোন বিশেষ ব্যবস্থা নয়। পুলিশকে শুধুমাত্র রিমান্ডের প্রস্তাব দিতে হয়। আদালত রিমান্ড মঞ্জুরের আগে দৈবাৎ খতিয়ে দেখেন।' [১৭]

এ বিষয়ে বহুল আলোচিত পার্থ সাহার মামলা'র[১৮] ঘটনা ক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, শৈবাল সাহা পার্থকে সাদা পোশাকধারী পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার করে চার দিন পর (২৯ আগষ্ট ২০০৪) তাকে ধানমন্ডি থানায় উপস্থাপন করে দণ্ডবিধির ৪১৯ ও ৫০৫ (ক) ধারার অধীনে এফআইআর দায়ের করা হয় যা পরবর্তীতে ৪৪৪ নং জি আর মামলায় পরিণত হয়। এই মামলায় তাকে দুই বার রিমান্ডে নেয়া হয়। কিন্তু পুলিশ তার কোন স্বীকারোক্তি মামলার নথিতে অর্ন্তভূক্ত করেনি। পরবর্তীতে তাকে আবার মতিঝিল থানার অন্য একটি বোমা বিস্ফোরণ মামলায় (মামলা নং ৯৭ (৮) ২০০৪) আটক দেখিয়ে পুনরায় রিমান্ডে নেয়া হয়। এধরনের ঘটনায় প্রতীয়মান হয়, রিমান্ড মঞ্জুরের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটগণ যথেষ্ট সতর্ক নন। ম্যাজিস্ট্রেটগণ পুলিশের আবেদনের প্রেক্ষিতে 'তোতা পাখির' মত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে আটকের আদেশ দিয়ে থাকেন।[১৯]

ঢাকা আইনজীবী সমিতির আরেকজন আইনজীবী বলেন, 'রিমান্ড মঞ্জুরের আগে হাইকোর্টের কোন নির্দেশনা বা সুপারিশ অনুসরণ করা হয় না। রিমান্ড পুলিশের জন্য বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। তারা যে কোন মামলায় রিমান্ডের আবেদন করে।'[২০]

বিস্তৃত সাক্ষাতকারে ঢাকা ছাড়া অন্যান্য মহানগরের আইনজীবীদের মধ্যে ভিন্ন মতামতও পরিলক্ষিত হয়। চট্টগ্রাম জেলা বার সমিতির সাবেক সভাপতি ও সিনিয়র আইনজীবী জনাব রেজাউল করিম চৌধুরীর মতে, 'গত আট-দশ বছর ধরে দেখছি যে, আদালত রিমান্ড মঞ্জুরের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। আগের তুলনায় রিমান্ড মঞ্জুরের সংখ্যা বেশ কমে এসেছে।'[২১]

---

১৬ ৭টি দলগত আলোচনা এবং ১২টি বিস্তৃত সাক্ষাৎকার-এ নাগরিক সমাজের সদস্য ও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ।

১৭ ঢাকায় এডভোকেটদের সাথে দলগত আলোচনা

১৮ ৫৬ ডি এল আর (২০০৪) ৬২০, আইন ও সালিশ কেন্দ্র ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ

১৯ Halim, Abdul (July 2005). "Police Power of Arrest and Remand." Law & Our Rights. Issue No.: 1999. The Daily Star. http://archive.thedailystar.net/law/2005/07/04/vision.htm

২০ ঢাকায় এডভোকেটদের সাথে দলগত আলোচনা

২১ চট্টগ্রামে জনাব রেজাউল করিম চৌধুরীর সাথে ব্লাস্টের সাক্ষাৎকার, ১ নভেম্বর, ২০১২

বিস্তৃত সাক্ষাৎকারে এসেছে যে, রিমান্ড মঞ্জুরে বা পুলিশ হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে বিচারিক কর্মকর্তাগণ যথেষ্ট সতর্ক নন। এ বিষয়ে উত্তরদাতা বিচারিক কর্মকর্তাদের প্রশ্ন করা হলে তারা বলেন, কতিপয় সীমাবদ্ধতার কারণে পর্যাপ্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেন না। তবে তারা রিমান্ড মঞ্জুরের ক্ষেত্রে মোটেই উদাসীন নন। তারা রিমান্ড মঞ্জুরের ক্ষেত্রে মামলার গুরুত্ব বিবেচনায় সচেষ্ট থাকেন। তাছাড়া তাদেরকে কতিপয় প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয়। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ম্যাজিস্ট্রেট নেই। একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে একই সঙ্গে অনেকগুলো মামলা পরিচালনা করতে হয়। যদি একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রতিটি মামলা পুঙ্খানপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখতে হয় এবং সব দলিলপত্র যাচাই বাছাই করতে হয় তাহলে দিনে কয়েকটির বেশী মামলা করতে পারবেন না। তখন প্রত্যেক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে মামলার স্তুপ হয়ে উঠবে। তাই মাজিস্ট্রেটকে খুব সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হলে তাদের পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। এটি বিচার বিভাগের বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নয়।

৩.৪ হাইকোর্টের নির্দেশনা সম্পর্কে সচেতনতা

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি বা তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার এবং রিমান্ডে নেয়ার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট এর নির্দেশনা প্রসঙ্গে তারা অবহিত কিনা। মাত্র ৬ জন বলেছেন যে তারা জানেন, ৪৬ জন বলেছেন এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না এবং ২ জন কোন জবাব দেননি। ৬ জন ব্যক্তি বলেছেন যারা হাইকোর্ট এর নির্দেশনা সম্পর্কে অবহিত আছেন তাদের দুইজন শুধুমাত্র রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের সময় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির আইনজীবীর উপস্থিতি থাকা সম্পর্কে জানেন, দুইজন জানেন যে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করা যায় না এবং বাকি দুইজন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করা সম্পর্কে জানেন।

অন্যদিকে একই বিষয়ে অর্থাৎ হাইকোর্টের নির্দেশনা সম্পর্কে নাগরিক সমাজের ৫৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪৩ জন বলেছেন যে, তারা রিমান্ড ও জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে হাইকোর্টের নির্দেশনা সম্পর্কে অবহিত। ১১ জন বলেছেন যে, তারা সঠিকভাবে জানেন না। আর ২ জন নির্দেশনা সম্পর্কে একেবারেই জানেন না। যারা হাইকোর্টের নির্দেশনা সম্পর্কে জানেন তাদের মধ্যে অর্থাৎ ৫৪ জনের মধ্যে; ২৯ জন কেবল হয়রানির জন্য কাউকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করা যাবে না; ৩২ জন গ্রেফতারের সময় পুলিশ কর্মকর্তা তার পরিচয় বলবেন; ৩২ জন পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেফতারের কারণ লিপিবদ্ধ করবেন; ৩৩ জন গ্রেফতারের তিন ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারের কারণ জানাবেন; ২৮ জন গ্রেফতারকৃত ব্যাক্তির স্বজনদের খবর দেবেন; ২৩ জন শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন থাকলে তা লিপিবদ্ধ করতে হবে; ২৬ জন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের আগে ও পরে চিকিৎসককে দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে এবং ১৮ জন নির্যাতনের অভিযোগ থাকলে ম্যাজিস্ট্রেট মেডিকেল বোর্ড গঠনের নির্দেশ দেবেন সম্পর্কে জানেন।

আবার ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৭ ধারার রিমান্ড বিষয়ে হাইকোর্টের নির্দেশনা সম্পর্কে অবহিত নাগরিক সমাজের সদস্যদের মধ্যে অর্থাৎ ৫৪ জনের মধ্যে; ৩৫ জন জিজ্ঞাসাবাদের সময় গ্রেফতারকৃতের আত্মীয়-স্বজন ও আইনজীবী উপস্থিত থাকতে পারবেন; ৩২ জন জেল গেইটে জিজ্ঞাসাবাদের পর ম্যাজিস্ট্রেট সর্বোচ্চ তিন দিন রিমান্ড মঞ্জুর করবেন; ২৭ জন কোন ব্যত্যয় হলে ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন; এবং ২৩ জন যদি জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হয় তবে তা কাঁচের দেয়াল নির্মিত ঘরের মধ্যে করতে হবে সম্পর্কে জানেন।

হাইকোর্টের নির্দেশনা সম্পর্কে সচেতনতা বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ এবং ১৬৭ ধারা সম্পর্কিত হাইকোর্টের নির্দেশনা পুলিশের কাছে পাঠানো হয়েছে কিনা- প্রশ্নের জবাবে ২০ জন উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে পাঠানো হয়েছে অপরপক্ষে ৬ জন বলেছেন পাঠানো হয়নি। আর দুই জন বলেন যে, এ ব্যপারে তারা কিছু জানেন না। হাইকোর্টের এই নির্দেশনা সম্পর্কে উত্তরদাতা আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাগণ অবহিত কিনা- জানতে চাওয়া হলে, ২১ জন বলেন তারা অবহিত এবং ৬ জন বলেন অবহিত নয়। একজন এ ব্যপারে একেবারেই অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। নির্দেশনার বিষয় সম্পর্কে তাদের দেওয়া উত্তরগুলো হচ্ছে- গ্রেফতারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারকৃতকে আদালতে প্রেরণ (২৬ জন), গ্রেফতারের সময় পুলিশের পরিচয়পত্র দেখানো (৭ জন) এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বলেন, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের স্বজনদের খবর দেওয়া। অন্যদিকে মাত্র দুই জন রিমান্ডের সময় আইনজীবী ও স্বজনদের উপস্থিতি থাকার নির্দেশনা সম্পর্কে জানেন এবং দুইজন বলেন, তাদের মনে নেই। তেমনিভাবে হাইকোর্টের নির্দেশনা সম্পর্কে বিচারিক কর্মকর্তাদের প্রশ্ন করা হয়, তারা এ ব্যাপারে অবহিত কি না। উত্তরে ১৩ জন বলেন যে, তারা অবহিত আছেন। তাদেরকে নির্দেশনার বিষয় সম্পর্কে বলতে অনুরোধ করা হলে ৯ জন সবিস্তারে বর্ণনা দেন। অবশিষ্টরা এটি তাদের মুখস্থ আছে বললেও কোন একটি নির্দেশনাও উল্লেখ করেন নি।

ফৌজদারি কার্যবিধি ছাড়া অন্যান্য আইনে বেআইনী গ্রেফতারের ক্ষেত্র ও পরিধি

ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারা ব্যতীত আরো কয়েকটি ধারায় যেমন: ধারা ৫৫, ১৫০, ১৫২ ও ১৫৫ পুলিশ বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারে। পুলিশ রংপুর মেট্রোপলিটন এলাকা ব্যতীত অন্য সকল মেট্রোপলিটন এলাকায় বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতারের ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৫, ১৫০, ১৫২ ও ১৫৫ প্রয়োগের পাশাপাশি মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশও প্রয়োগ করছে। মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুলিশকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার সুযোগ প্রদান করেছে। তাছাড়া পুলিশ ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায়ও বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারে।

মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশসমূহ

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ ১৯৭৬ -এর ৮৬ ও ১০০ ধারা, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ ১৯৭৮- এর ৮৮ ও ১০৩ ধারা, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ ১৯৮৫-এর ৮৯ ও ১০৪ ধারা, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ ১৯৯২, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ আইন, ২০০৯ এবং বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ আইন, ২০০৯ -এর ১০৪ ধারা বলে বিশেষ পরিস্থিতিতে পুলিশকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশের ১০০ ধারায় বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি এই অধ্যাদেশে বা অন্য কোন আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের করলে কিংবা অপরাধ প্রতীয়মান হলে পুলিশ তাকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারে। অন্যান্য মেট্রোপলিটন অধ্যাদেশে অনুরূপ ধারা আছে। উল্লেখিত অধ্যাদেশসমূহে পুলিশ যদি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত অবস্থায় কোনো ব্যক্তিকে দেখলে তাকে গ্রেফতার করতে পারে।

ক. কোনো সন্তোষজনক কারণ ছাড়া বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি বহন করা; অথবা

খ. কোনো সন্তোষজনক কারণ ছাড়া মুখমন্ডল আবৃত করা বা ছদ্মবেশ ধারণ করা অথবা;

গ. কোনো সন্তোষজনক কারণ ছাড়া বসতবাড়ি, ভবন, জাহাজ বা নৌকায় অথবা যে কোনো যানবাহনে অবস্থান ; অথবা

ঘ. সন্তোষজনক কারণ ছাড়া রাস্তা, খোলা ছাদে ও অন্য কোথাও শুয়ে থাকা বা ইত:স্তত ঘোরাফেরা করা ; অথবা

ঙ. সন্তোষজনক কারণ ছাড়া কোনো বাড়ি ভাংচুর করা

তাছাড়া মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশসমূহ অনুসারে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতরের আরো কিছু বিধান রয়েছে।

আমাদের এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমুহ হলো– হাইকোর্টের নির্দেশনার নীতি ও আইনগত সংস্কার ও বাস্তবতার বিষয়টি সরেজমিনে খতিয়ে দেখা। বিগত ১০ বছরের রায়, নীতি ও আইনী উন্নয়নের পর্যালোচনা, এবং ফৌজদারি আদালতের আইনজীবীদের মতামত সম্পর্কে অবহিত হওয়া। ব্লাস্ট ও অন্যান্য বনাম সরকার ও অন্যান্য মামলার রায় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিগত ১০ বছরে (২০০৩-২০১৩) হাইকোর্টের নির্দেশনা বা সুপারিশ বাস্তবায়নে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। হাইকোর্টের নির্দেশনার পর উল্লেখযোগ্য আইনগত ও বিচারিক অগ্রগতির মধ্যে ২০১৩ সালের নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ও ২০০৩ সালে আগস্ট মাসে অপর এক মামলায়[২২] উচ্চতর আদালত গ্রেফতার ও রিমান্ডে সম্পর্কে আরো কতিপয় নির্দেশনা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাছাড়া স্বল্প পরিসরে হলেও নিম্ন ও উচ্চ আদালতের অনেক আদেশ ও রায়ে এই নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ২০০৪ সালের নূরুল ইসলাম বাবুল বনাম রাষ্ট্র[২৩] ও আইন ও সালিশ কেন্দ্র ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ[২৪] মামলার রায় উল্লেখ করা যেতে পারে। নূরুল ইসলাম বাবুল বনাম রাষ্ট্র মামলায় হাইকোর্ট বিভাগ ব্লাস্ট মামলার নির্দেশনা অনুসরণ করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বাতিল করে। আবার আইন ও সালিশ কেন্দ্র ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ মামলার রায়ে অভিযুক্তকে পুনরায় রিমান্ড আদেশ না দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। হাইকোর্টের নির্দেশনার পর নিম্ন আদালতে পুলিশের রিমান্ড সংক্রান্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত 'হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুসরণ করে জিজ্ঞাসাবাদ করার' নির্দেশনা দিয়ে আদেশ দেওয়ার একটি রেওয়াজ গড়ে উঠছে, যদিও তা অনেক অপ্রতুল।

২২ মো: সাইফুজ্জামান বনাম রাষ্ট্র ও অন্যান্য, ৫৬ ডিএলআর, (এইচসিডি), ২০০৪, ৩২৪

২৩ ৫৬ ডিএলআর (২০০৪) ৩৪৭

২৪ ৫৬ ডিএলআর (২০০৪) ৬২০

গ্রেফতার ও রিমান্ড সম্পর্কিত আইনগত ও বিচারিক অগ্রগতি

৫.১ মো: সাইফুজ্জামান বনাম রাষ্ট্র ও অন্যান্য মামলায় হাই কোর্টের নির্দেশনা

সাইফুজ্জামান বনাম রাষ্ট্র ও অন্যান্য মামলায়[২৫] সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের তৎকালীন মাননীয় বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা ও মাননীয় বিচারপতি শরীফউদ্দিন চাকলাদার-এর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ গ্রেফতার ও রিমান্ড সম্পর্কে আরো কতিপয় নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত হাইকোর্ট বেঞ্চ উল্লেখ করেন যে, ব্লাস্ট মামলায় এ বিষয়ে কিছু নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষায় আরো কিছু নির্দেশনা প্রদান প্রয়োজন। এই মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশনাগুলো হলো:-

১. পুলিশ কর্মকর্তা কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতারের পর তাৎক্ষনিকভাবে গ্রেফতারের একটি মেমো তৈরী করবেন এবং উক্ত মেমোতে সময় ও তারিখ উল্লেখ করে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির স্বাক্ষর নিতে হবে।

২. গ্রেফতারের পর সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়কে বা নিকট আত্মীয়র অবর্তমানে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির অভিপ্রায় অনুযায়ী তার কোন বন্ধুকে যত দ্রুত সম্ভব (কোনক্রমেই ৬ ঘন্টার অধিক নয়) গ্রেফতারের স্থান ও সময় এবং কাস্টডির স্থান জানাতে হবে।

৩. গ্রেফতারের কারণ, যে ব্যক্তি গ্রেফতারের জন্য পুলিশকে সংবাদ প্রদান করেছে বা অভিযোগ করেছে তার নাম ঠিকানাসহ বিস্তারিত পরিচয়, আত্মীয় বা বন্ধু যার কাছে গ্রেফতারের তথ্য প্রদান করা হয়েছে তার নাম ঠিকানাসহ বিস্তারিত পরিচয় এবং যে পুলিশ কর্মকর্তার হেফাজতে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি অবস্থান করছে তার নাম ও বিস্তারিত পরিচয় অবশ্যই ডাইরীতে লিখতে হবে।

৪. কার্যবিধির ১৬৭ ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের জন্য গ্রেফতারকৃতকে আদালতে উপস্থানের সময় গ্রেফতারের মেমো, আমলযোগ্য অপরাধ সংগঠনের তথ্য বা অভিযোগের প্রতিলিপি এবং ডাইরীর লিখিত সকল তথ্যের প্রতিলিপিসহ সকল কাগজ-পত্রের প্রতিলিপি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অবশ্যই প্রেরণ করতে হবে।

৫. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে যদি পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয় তাহলে উক্ত রিমান্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করতে হবে এবং কোনোক্রমেই তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থাপন করা ব্যতীত বিচারিক হেফাজত বা হাজতে পাঠানো যাবে না।

২৫ ৫৬ ডিএলআর, (এইচসিডি), ২০০৪, ৩২৪

৬. ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬২ (২) ধারার বলে পুলিশ হেফাজতে অথবা হাজতে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে আটক রাখার অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হচ্ছে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু থাকা।

৭. উপরোক্ত ৪ নং নির্দেশনায় বর্ণিত ডাইরীসহ অন্যান্য কাগজপত্রের প্রতিলিপি ছাড়া কোনো গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে পুলিশ বা অন্যকোন হেফাজতে আটক রাখার জন্য আদালতে হাজির করা হলে ম্যাজিস্ট্রেটের ১৬৯ ধারা মোতাবেক মুচলেকা নিয়ে তাকে ছেড়ে দেবেন।

৮. যদি একজন পুলিশ অফিসার আগে থেকেই হেফাজতে থাকা কোন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট কোন মামলায় গ্রেফতার দেখাতে চায়, তাহলে সেই মামলা সংক্রান্ত ডায়েরির প্রতিলিপিসহ গ্রেফতারকৃত/অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থাপন না করা হলে ম্যাজিস্ট্রেট এমন আবেদন গ্রহণ করবেন না।

৯. যদি উপরে বর্ণিত শর্তসমূহ পূরণের পর ১৬৭(২) ধারা অনুযায়ী গ্রেফতারের ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ না হয়, তাহলে মামলাটি আমলে নেওয়ার এখতিয়ার সম্পন্ন কোন ম্যাজিস্ট্রেট নিজেঅথবা এরূপ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রাইবুনাল বা জজের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে কার্যবিধির ৩৪৪ ধারায় ১৫ দিনের অধিক নয় এমন কোন মেয়াদের জন্য রিমান্ডে পাঠাতে পারবেন।

১০. যদি পুলিশের প্রেরিত প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয় যে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে নিবর্তনমূলক আটকে রাখার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে তাহলে–সে অবস্থায় ম্যাজিস্ট্রেট ঐ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে আটক আদেশ প্রদান করবেন না।

১১. যে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থাপন করা হয়েছে সে ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্য হবে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি বিষয়ে ১৬৭ ধারার অধীনে কোন আদেশ প্রদানের আগে উপরোক্ত শর্তসমূহ যথাযথ পরিপালন করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া।

সাইফুজ্জামান বনাম রাষ্ট্র মামলার রায়ে প্রদত্ত নির্দেশনাগুলো ব্লাস্ট মামলায় প্রদত্ত নির্দেশনাগুলোর সম্পূরক এবং এ গুলো লঙ্ঘন করলে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। আবার ব্লাস্ট মামলাটি আপীল বিভাগে বিচারাধীন। এই মামলার লিভ টু আপীল-এর আদেশে আপীল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে কোন স্থগিতাদেশ দেন নাই[২৬] ফলে আইন অনুযায়ী এই নির্দেশনাগুলো সকলের জন্য বাধ্যকর।

২৬ Civil Petition for Leave to Appeal No 498 of 2003

৫.২ নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩

২০১৩ সালে সংসদ নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন পাশ করে। এই আইনে ব্লাস্টের মামলায় প্রদত্ত সুপারিশের ভিত্তিতে কতিপয় বিধান অর্ন্তভুক্ত করা হয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যুকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে ২০১৩ সালের ২৭ অক্টোবর নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩ পাশ হয়।[২৭]

এ আইনে নির্যাতন, হেফাজতে মৃত্যু ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংজ্ঞা প্রদান হয়। 'নির্যাতন' অর্থ কষ্ট হয় এমন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন; তথ্য বা স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য সন্দেহভাজন অথবা অপরাধী কোন ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান, ভয় ভীতি দেখানো এবং পক্ষপাতমূলকভাবে কোনো প্ররোচনা বা উস্কানি বা কারো সম্মতিক্রমে কোন সরকারী কর্মকর্তার নিজ ক্ষমতাবলে বা সরকারী ক্ষমতাবলে এইরূপ কার্যকলাপ নির্যাতন বলে গণ্য হবে।[২৮]

আর 'হেফাজতে মৃত্যু' অর্থ সরকারী কোন কর্মকর্তার হেফাজতে কোন মৃত্যু, তাছাড়া হেফাজতে মৃত্যু বলতে অবৈধ আটকাদেশ, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক গ্রেপ্তারকালে কোন ব্যক্তির মৃত্যুকে নির্দেশ করবে। এবং কোন মামলার জিজ্ঞাসাবাদ কালে (সাক্ষী থাকুক বা না থাকুক) মৃত্যুও হেফাজতে মৃত্যুর অর্ন্তভূক্ত হবে।[২৯]

আবার 'আইন প্রয়োগকারী সংস্থা' বলতে পুলিশ, র‍্যাব, অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), গোয়েন্দা সংস্থাসমুহ, বিজিবি, শুল্ক বিভাগ, ইমিগ্রেশন, আনসার, গ্রাম প্রতিরক্ষা দল ও কোস্টগার্ডকে চিহ্নিত করবে।[৩০]

এই আইনে কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে নির্যাতন করলে তা ওই ব্যক্তির কৃত অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। কোনো ব্যক্তি আইনে বর্ণিত অপরাধ সংগঠনে উদ্যোগ নিলে, সংগঠনে সহায়তা ও প্ররোচিত করলে অথবা ষড়যন্ত্র করলে তিনি এই আইনের অধীনে অপরাধ করেছেন বলে গন্য হবে[৩১] এবং অপরাধসমুহ আমলযোগ্য; আপোষ ও জামিনের অযোগ্য। হেফাজতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে নির্যাতনকারী ব্যক্তির অনূন্য যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা অন্যূন্য এক লাখ টাকা অর্থদন্ড কিংবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন এবং এর অতিরিক্ত ক্ষতিগ্রস্থ বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা ব্যক্তিদেরকে দুই লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন।[৩২] এই আইনে আরো বিধান করা হয়েছে যে, যুদ্ধাবস্থা, অস্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক অবস্থা, জরুরি অবস্থা কিংবা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশে নির্যাতন করা হয়েছে – এমন অযুহাত অগ্রহণযোগ্য হবে।[৩৩]

২৭ যদিও এই বিলটি প্রথমে ২০০৯ সালের পূর্বে সংসদে পেশ করা হয়েছে, মাননীয় সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী

২৮ নির্যাতন ও পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩-এর ২(৬) ধারা

২৯ নির্যাতন ও পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩-এর ২(৭) ধারা

৩০ নির্যাতন ও পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩-এর ২(৪) ধারা

৩১ নির্যাতন ও পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩-এর ১৩ ধারা

৩২ নির্যাতন ও পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩-এর ১৫ ধারা

৩৩ নির্যাতন ও পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩-এর ১২ ধারা

কেউ যদি কোন দাবি করে যে তকে নির্যাতন করা হয়েছে, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে আদালত ওই ব্যক্তির বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করার নির্দেশ দিবেন।[৩৪]এ আইনে মামলা দায়েরের ১৮০ দিনের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করতে হবে। আদালতের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কারণে উক্ত সময়সীমার মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করতে না পারলে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করবেন। কোন সরকারি কর্মকর্তা অথবা এর পক্ষে কর্তব্যরত কোন ব্যক্তির গাফিলতি বা অসতর্কতার কারণে অভিযোগকারী ক্ষতিগ্রস্ত হলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বা তার পক্ষে কর্তব্যরত ব্যক্তিকে প্রমান করতে হবে যে তাদের গাফিলতি বা অসতর্কতার কারণে ওই ক্ষতি হয়নি।[৩৫]

নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩-এর এই বিধানসমূহ এবং ব্লাস্টের মামলায় প্রদত্ত রায়ের পর্যবেক্ষণ সমূহের সাথে বিশ্লেষণ করলে কিছু সাদৃশ্য খুজে পাওয়া যায়। ব্লাস্টের মামলায় হাইকোর্টের পর্যবেক্ষনগুলো নিম্নরূপঃ

দন্ডবিধির ৩৩০ ধারায় কোন ব্যক্তির কাছ থেকে স্বীকারোক্তি বা তথ্য আদায়ের জন্য বলপ্রয়োগ বা আঘাত করা এবং ৩৪৮ ধারায় স্বীকারোক্তি বা তথ্য আদায়ের জন্য বেআইনীভাবে আটক রাখার বিষয়ে শাস্তির বিধান রয়েছে। কিন্তু কোন ব্যক্তি কারাগার বা পুলিশ হেফাজতে থাকাকালে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি ওই ধারাগুলোতে উল্লেখ নেই। শাস্তির বিধান যথেষ্ট নয় বলে মনে হয়। অতএব, আমরা এই ধারা দুটিতে উপযুক্ত বিধান সংযুক্ত করা অথবা নতুন দুটি উপধারা ৩৩০ (ক) ও ৩৪৮ (ক) সংযুক্ত করার সুপারিশ করছি। তাছাড়া কারাগার বা পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু সাধারণভাবে খুনের চেয়েও বেশি ভয়ংকর মনে করি। তাই দন্ডবিধির ৩০২ ধারার সাথে হেফাজতে মৃত্যুর শাস্তির বিধান করে একটি ধারা যুক্ত করা যেতে পারে।

হাইকোর্টে বিভাগ দন্ডবিধির বিদ্যমান ৩০২, ৩৩০ ও ৩৪৮ ধারা সংশোধনেরও সুপারিশ করেছে।

হাইকোর্টের সুপারিশ হলোঃ-

(ক) ৩৩০ ধারায় কারাগার বা পুলিশ হেফাজতে আঘাতের জন্য শাস্তি বৃদ্ধি করে ক্ষতিগ্রস্তকে আর্থিক ক্ষতিপুরণের পাশাপাশি সর্বোচ্চ ১০ বছর থেকে সর্বনিম্ন ৭ বছরের কারাদণ্ডের বিধান যুক্ত করা।

(খ) অনুরূপ পুলিশ হেফাজতে মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তকে আর্থিক ক্ষতিপুরণের পাশাপাশি ১০ বছরের শাস্তির বিধান রেখে ২য় আরেকটি শর্ত যুক্ত করা।

---

৩৪ নির্যাতন ও পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩-এর ৮ ধারা

৩৫ নির্যাতন ও পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩-এর ৯ ও ১০ ধারা

(গ) দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার সাথে একটি নতুন ধারা ৩০২ (ক)-এ কারাগার ও পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু হলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়দের আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিধান রাখার পাশাপাশি শাস্তির বিধান যুক্ত করা যেতে পারে।

(ঘ) ৩৪৮ এর সঙ্গে একটি নতুন ধারা যুক্ত করে তথ্য আদায়ের জন্য পুলিশ অফিসার কর্তৃক বেআইনিভাবে আটক রাখার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৩ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৭ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রাখা যেতে পারে।

হাইকোর্টের রায়ে সাক্ষ্য আইন পরিবর্তনের কথাও বলা হয়েছে। পুলিশ হেফাজতে বা কারাগারে মৃত্যু হলে কে এজন্য দায়ী তা প্রমান করা কঠিন। অনেক সময় যখন কোন নারী স্বামীর হেফাজতে মারা যায়, তখন স্বামীকে কৈফিয়ত দিতে হয় যে কি করে তার মৃত্যু ঘটল। একই নিয়মে পুলিশ হেফাজতে বা কারাগারে কারো মৃত্যু হলে একই নীতি অনুসরণ করা যেতে পারে। আদালত উপরোক্ত নীতিরও আইনি ভিত্তি প্রদান করতে সাক্ষ্য আইনে ১০৬ ধারার পর একটি নতুন ধারা অথবা ১১৪ ধারায় এই নীতি সংযুক্ত করার জন্য সুপারিশ করে।

সাক্ষ্য আইনে নতুন ধারায় এরকম বিধান রাখা যেতে পারে, যখন পুলিশ হেফাজত বা কারাগারে কারো মৃত্যু হয় তখন যে পুলিশ কর্মকর্তার হেফাজতে ছিল বা যে পুলিশ কর্মকর্তা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়েছে বা যে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছে সে কারাগারের কর্তৃপক্ষকে মুত্যর কারণ ব্যাখ্য করতে হবে এবং প্রদত্ত ব্যাখ্য প্রমান করার জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য ও ঘটনা প্রদান করতে হবে।

নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩ ও ব্লাস্ট ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ ও অন্যান্য[৩৬] রায় একত্রে বিবেচনা করলে দেখা যায় রায় ঘোষণার ১০ বৎসর পর সংসদে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু নিবারণ আইন পাশ হয়। উক্ত রায়ের কতিপয় মৌলিক বিষয় যেমন: পুলিশী নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যুর জন্য শাস্তির বিধান করা, হেফাজতে মৃত্যু ও নির্যাতন প্রমানের ভার সংক্রান্ত সাক্ষ্য আইনের নীতি অর্ন্তভূক্ত করা, সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান ইত্যাদি নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইনে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, ভবিষ্যতে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইনের আওতায় মামলাসমূহে উচ্চ আদালতের এই পর্যবেক্ষণগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। যদিও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার সুযোগ এবং অর্পিত দায়িত্ব পালনে বাধাগ্রস্ত হওয়ার অজুহাতে পুলিশের প্রধান কার্যালয় থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত এক প্রত্রে এই আইনের ১৪টি ধারা ও উপধারায় সংশোধন এবং সাতটি ধারা বিলুপ্ত ও একটি নতুন ধারা সংযুক্ত করে এই আইনের সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।[৩৭]

৩৬ ৫৫ ডিএলআর (এইচসিডি)(২০০৩) ৩৬৩

৩৭ নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন: নিজেদের সুবিধায় আইনের সংশোধন চায় পুলিশ, প্রথম আলো, মার্চ ০৫, ২০১৫

উপসংহার ও সুপারিশসমূহ

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই গবেষণা সমীক্ষার প্রেক্ষাপট, গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা সম্পর্কিত হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারা ব্যতীত অন্যান্য আইনে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতারের ক্ষেত্র ও পরিধি এবং পঞ্চম অধ্যায়ে গ্রেফতার ও রিমান্ড সম্পর্কিত আইনগত ও বিচারিক অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই সমাপনী অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ের পর্যালোচনা সমূহের সারসংক্ষেপ বিশ্লেষনের চেষ্টা করা হয়েছে। সবশেষে এসব বিশ্লেষণ এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি, নাগরিক সমাজের সদস্য ও আইনজীবীদের মতামতের ভিত্তিতে সুপারিশমালা প্রস্তত করা হয়েছে।

৬.১ উপসংহার

গবেষণার পর্যবেক্ষনসমুহ থেকে দেখা যায় যে, বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার, বিনা বিচারে আটক, পুলিশ হেফাজতে নির্যাতন থেকে সুরক্ষা সম্পর্কিত হাইকোর্টের নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে পালন ও অনুসরণ করা হয় না। তিনটি উল্লেখযোগ্য নির্দেশনা অংশত কার্যকর হয় তা হলো:

১. বাড়ী বাকর্মস্থলের বাইরে গ্রেফতার করা হলে এক ঘন্টার মধ্যে পুলিশ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির পরিবারকে অবহিত করা।

২. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী এবং আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ বা নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া।

৩. গ্রেফতারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে আদালতে হাজির করা।

এর বাইরে অন্য গুরত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহ যেমন, গ্রেফতারকালে গ্রেফতারের কারণ অবহিত করা, গ্রেফতারের তিন ঘন্টার মধ্যে কারণ সবিস্তারে বলা, গ্রেফতারের পর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা, রিমান্ডের আদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা, নির্দিষ্টকৃত কাঁচ ঘেরা কক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ করা, রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের সময় আইনজীবী বা নিকটাত্মীয়ের উপস্থিত থাকা, রিমান্ডের আগে ও পরে ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষার সার্টিফিকেট এবং গ্রেফতারকৃত বা রিমান্ডেনীত ব্যক্তিকে নির্যাতনের জন্য পুলিশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ন্যূনতম পর্যায়েও অনুসরণ করা হয় না।

গ্রেফতারকৃত ও রিমান্ডেনীত ব্যক্তিবর্গ ও তাদের পরিবারের এবং নাগরিক সমাজের সদস্যরা গ্রেফতারের সময় ও পরে পুলিশের আচরণ কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ কালে মারাত্মকভাবে নির্যাতনের রোমহর্ষক কাহিনীও বলেছেন কয়েকজন গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিবর্গ ও নাগরিক সমাজের সদস্যরা গ্রেফতার এবং রিমান্ডে পুলিশ নির্যাতন ও ক্ষমতার অপব্যবহারের নানা কারণ বর্ণনা করেছেন। তারা বলেছেন যে, পুলিশের কাজ হচ্ছে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান, আইন শৃঙ্খলার উন্নয়ন, অপরাধ দমন। পুলিশকে এসব জনস্বার্থ সম্পর্কিত কাজে নিয়োজিত করার ক্ষেত্রে সরকারের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে। তদুপরি তারা পুলিশ বাহিনীকে হীন রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে। পুলিশের দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের নানা কারণ ও বর্ণনা করেছেন। অনেকে বলেছেন যে, পুলিশের চাকরির জন্য লাখ লাখ টাকা উৎকোচ দিতে হয়। এই টাকা উশুল করতে পুলিশ কিছু ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার করেন।

নাগরিক সমাজের সদস্যরা পুলিশি ব্যবস্থার জবাবদিহিতার অভাবকে অন্যতম কারণ বলে তুলে ধরেছেন। তারা বলেছেন, এমন কোন নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থাপনা বা ফোরাম নেই যেখানে জনগণ পুলিশি নির্যাতনের প্রতিকার চাইতে পারে। তারা বলেন, সাধারণ মানুষের এত সাহস নেই যে, তারা পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করবে। আরেকবার নির্যাতিত হতে হয়–এমন কোন ঝুঁকি নিয়ে সেটি তারা করবেন না। নাগরিক সমাজের সদস্যরা বলেন যে, খারাপ পুলিশের শাস্তির জন্য পুলিশ বিভাগের অভ্যন্তরে কার্যকর ইউনিট/ বিভাগ থাকতে হবে। কিন্তু জনগণ পুলিশের নিজস্ব প্রক্রিয়ার ওপর আস্থা রাখেন না। জনগণের এমন অনাস্থার কারণ হলো–তারা পুলিশের আচরণের কোন ইতিবাচক পরিবর্তন দেখেন না।

কিছু আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা গ্রেফতারকালে ও রিমান্ডে কোনো রকম নির্যাতনের কথা অস্বীকার করলেও কিছু কিছু বিস্তৃত সাক্ষাৎকারে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার ও রিমান্ডে দুর্ব্যবহারের কথা স্বীকার করেন। তারা বলেন যে, তাদের আচরণগত ত্রুটি রয়েছে। তাদের রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবসহ, অবকাঠামোগত অপ্রতুলতা, স্বল্প বেতন, ব্যাপক দুর্নীতিসহ নানা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তদুপরি পুলিশকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হয়।

বিচারিক কর্মকর্তা গ্রেফতারকালে ও পরে এবং রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের সময় নির্যাতনের বিষয়টি স্বীকার করেন। তারা দাবি করেন যে, তারা তাদের সাধ্যমত দৃষ্টি রাখেন- যাতে পুলিশ হেফাজতে কোনো রকম নির্যাতন না করে। তারা এও বলেন যে, তাদের কাজের কিছু সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। প্রতিদিন অসংখ্য মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে তাদের ব্যাপক কাজের চাপে থাকতে হয়। পুলিশ প্রতিদিন অসংখ্য মামলায় পুন:তদন্তের জন্য রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করে। তাই তারা প্রতিটি মামলায় বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার মতো সময় পান না। অপরাধী সংক্রান্ত অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দেখে যদি মনে করেন যে,

রিমান্ড আবেদন ঠিক আছে। তখন তারা রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তারা সবসময় হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুসরণ করেন না। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট কিছু কাগজপত্র তাদের খতিয়ে দেখতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মামলার যথাযথ ডায়েরিভূক্তিকরণ। রিমান্ডে দেওয়ার আগে ও পরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রসঙ্গে বিচারিক কর্মকর্তা বলেন যে, এটি এখনো রেওয়াজে পরিণত হয়নি। যখন মারাত্মক শারীরিক নির্যাতনের জখম দৃশ্যমান হয়, তখন অবশ্যই ম্যাজিস্ট্রেটরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা চিকিৎসার আদেশ দেন অথবা যখন রিমান্ডেনীত ব্যক্তি নির্যাতনের অভিযোগ করেন বা অভিযুক্তের আইনজীবী স্বাস্থ্য পরীক্ষার দাবী করেন তখনও ম্যাজিস্ট্রেটরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা চিকিৎসার আদেশ দেন । তবে রিমান্ডেনীত ব্যক্তি বা আইনজীবীর পক্ষ থেকে এমন দাবির ঘটনা কদাচিৎ ওঠে থাকে।

বিচারিক কর্মকর্তা বিস্তৃত সাক্ষাৎকারে কিছু বাস্তব প্রতিবন্ধকতার কথা তুলে ধরেন। গ্রেফতারের পর বা রিমান্ডে নির্যাতন না করার জন্য পুলিশ কর্মকর্তাদের সতর্ক করে দেওয়া হয় কিন্তু কোন কোন সময় পুলিশ তাদের নির্দেশনা মানেন না। অথচ এজন্য বিচারিক কর্মকর্তাদের তেমন কিছু করার নেই। পুলিশের বিরুদ্ধে কদাচিৎ বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পুলিশের ওপর বিচারিক কর্মকর্তাদের সামান্যই নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। অপরদিকে পুলিশের সহযোগিতার ওপর বিচারিক কর্মকর্তাদের অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভর করতে হয়। তারা এই ভয়ে থাকেন যে, পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার কারণে পুলিশ যদি বিচারিক কর্মকর্তাকে সহযোগিতা না করে। এমন অবস্থায় তাদের জন্য কোর্ট পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়বে। কিছু বিচারিক কর্মকর্তা আধা-কাঠামোগত সাক্ষাৎকারে তাদের ওপর সরকার বা রাজনৈতিক প্রভাবের কথা স্বীকার করেন আবার কিছু বিচারিক কর্মকর্তা তাদের ওপর সরকার ও রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন নাই। কিছু বিচারিক কর্মকর্তা বিস্তৃত সাক্ষাৎকার বলেন যে, ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য তাদের ওপর চাপ আসে তবে তা সামান্যই।

হাইকোর্টের নির্দেশনা সম্পর্কে সচেতনতা প্রসঙ্গে কিছু বিচারিক কর্মকর্তা জানান যে, তারা গ্রেফতার ও রিমান্ডে হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুসরণের জন্য একটি সার্কুলার পেয়েছেন। কিন্তু অন্যরা বলেন যে, তারা এধরনের সার্কুলার পাননি। কিন্তু কেউ সার্কুলারটি দেখাতে পারেননি। এটি স্পষ্ট নয় যে, বিচারিক কর্মকর্তাদেরকে আসলে গ্রেফতার ও রিমান্ডের ব্যাপারে হাইকোর্টের নির্দেশনা সম্বলিত সার্কুলার দেওয়া হয়েছে কিনা। নির্দেশনা সম্বলিত পত্র পাননি এমন একজন বিচারিক কর্মকর্তা সংশয় প্রকাশ করে বলেন যে, তাদের সবার জন্য এটি অনুসরণীয় নাও হতে পারে। আইন প্রয়োগকারীদের কাছ থেকেও একই রকম পর্যবেক্ষণ পাওয়া যায়। তাদের জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন যে, তারা গ্রেফতার ও রিমান্ডের নির্দেশনা সম্পর্কে জানেন। কিন্তু তারা নির্দেশনার বেশীরভাগই উল্লেখ করতে পারেন নি। যদিও গত ৩১ আগস্ট ২০১০ তারিখে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স-এর এক পরিপত্রে[৩৮] মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা যথাযথভাবে

৩৮ স্মরক নং- আইন/রীট/৬-৯৯(রীট)/২০১৫/(৮৫), তারিখ - ৩১ আগস্ট ২০১৫

প্রতিপালনের জন্য সকল পুলিশ ইউনিটকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এই গবেষণা সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, নাগরিক সমাজের বেশীরভাগ সদস্য হাইকোর্টের নির্দেশনা সম্পর্কে অবহিত। নাগরিক সমাজের সদস্য যারা সাক্ষাৎকার ও দলগত আলোচনার অংশ নিয়েছেন তারা শতকরা ৫০ ভাগ হাইকোর্টের নির্দেশনার অংশ বিশেষ জানেন।

এই গবেষণা সমীক্ষা কেবল ৭ টি মেট্রোপলিটন এলাকায় পরিচালিত হয়েছে। এই শহরগুলোতে ব্লাস্টের ইউনিট অফিস রয়েছে এবং ব্লাস্ট সেখানে হাইকোর্টের নির্দেশনা সম্পর্কে অ্যাডভোকেসি সভা ও উদ্বুদ্ধকরণ মেলাসহ নানা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তাছাড়া বিভিন্ন শহরে হাইকোর্টের নির্দেশনা সম্বলিত পোস্টার লাগানো হয়েছে। যে কারণে সামান্য সচেতনতা তৈরী হতে পারে।

৬.২ সুপারিশসমুহ

গ্রেফতার ও রিমান্ডের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের জন্য পুলিশ কর্মকর্তা ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। তবে এ ক্ষেত্রে সরকারের দিকনির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতা অত্যাবশ্যকীয়। এ সব বিবেচনায় রেখে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হলোঃ

সরকারের জন্য

১. ব্লাস্ট ও অন্যান্য বনাম সরকার ও অন্যান্য মামলার রায়ে প্রদত্ত নির্দেশনা ও সাইফুজ্জামান বনাম রাষ্ট্র ও অন্যান্য মামলায় প্রদত্ত নির্দেশনার ভিত্তিতে আইনি সংস্কার করা।

২. হাইকোর্টের এই নির্দেশনার ভিত্তিতে আইনি সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা।

৩. ব্লাস্টের মামলায় হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী দণ্ডবিধির ৩০২, ৩৩০ ও ৩৪৮ ধারা এবং প্রমানের ভার (burden of proof) সংক্রান্ত সাক্ষ্য আইনের নীতি সংশ্লিষ্ট ১০৬ ও ১১৪ ধারার সংশোধন করা।

৪. হাইকোর্টের নির্দেশনাসমূহকে গেজেট আকারে প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণ করা।

৫. ব্লাস্ট ও সাইফুজ্জামানের মামলায় প্রদত্ত সুপারিশমালার ভিত্তিতে আইনি সংস্কারের পূর্বে নির্দেশনা কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৬. হাইকোর্টের নির্দেশনা এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩ ব্যাপকভাবে প্রচার করা- যাতে বিচার বিভাগ, পুলিশ, আইনজীবী ও সাধারণ মানুষ এই আইন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে।

৭. এই নির্দেশনা বাস্তবায়নে বিচারিক প্রতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিম্নরূপভাবে নিশ্চিত করা যেতে পারে।

৮. ব্যাপক সংখ্যক মামলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী জজ নিয়োগ করা।

৯. গ্রেফতারকৃত ও রিমান্ডে নেওয়া ব্যক্তিদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত আচরণের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

১০. আদালতের মামলার স্তুপ কমিয়ে আনা।– যাতে ম্যাজিস্ট্রেটরা প্রতিটি মামলায় পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন।

১১. হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কাচ ও গ্রিলে ঘেরা কক্ষ তৈরী করা।

১২. দুর্নীতি প্রতিরোধের ওপর নজরদারি ও সতর্কতা অবলম্বণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

১৩. পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রসারসহ পুলিশ বিভাগকে যুগোপোযোগী করা।

১৪. পুলিশে শক্তিশালী ও কার্যকর জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা চালু করা।

১৫. পুলিশের বেতনসহ সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা–যাতে তাদের আর্থিক দুর্নীতি বা দুর্নীতির জন্য আইনের অপব্যবহার করতে না হয়।

১৬. হাইকোর্টের নির্দেশনা এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩-এ ডাক্তারদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা।

১৭. নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ মাধ্যমে জনগণ যাতে প্রতিকার পেতে পারে- সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৮. পুলিশের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা যা মহাপরিদর্শক থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত চালু করা যেতে পারে।

১৯. কাজের ক্ষেত্রে পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর ওপর সকল প্রভাব রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত করা–যাতে তারা কেবল আইন অনুযায়ী চলতে পারে।

২০. পুলিশের মধ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী চালু করা এবং থানা, জেলা বিভাগ, মহানগর ও কেন্দ্রসহ সকল পর্যায়ে ভালো ভূমিকার জন্য যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা–যাতে সৎ, আন্তরিক ও যোগ্য পুলিশ কর্মকর্তারা ভালো কাজের জন্য পুরষ্কার বা অন্য সুবিধাদি পেতে পারেন।

২১. যারা নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বা অন্য কোন আইনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে নির্যাতন ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ আনেন তাদেরকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও আইনি সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

২২. রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের পদ্ধতি সম্পর্কে পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গল সংশোধন করে একটি নতুন বিধি অর্ন্তভূক্ত করা।

নাগরিক সমাজের জন্য

১. সরকারের কাছে সুপারিশ রাখা যাতে সরকার হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী আইনী সংস্কার করে।

২. পুলিশের ক্ষমতা অপব্যবহারের মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সঙ্গে পরামর্শ করা, কার্যকর পন্থা গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৩. হাইকোর্টের নির্দেশনার (ব্লাস্ট এবং সাইফুজ্জামান মামলার রায়ে প্রদত্ত) ব্যাপকভাবে প্রচার করা।

৪. জনগণের মাঝে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং এই আইন প্রয়োগে সংশ্লিষ্টদের উৎসাহিত ও সহযোগিতা করা।

মহামান্য হাইকোর্ট প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে গ্রেফতার ও রিমান্ডের ক্ষেত্রে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহঃ

গত ৭ই এপ্রিল ২০০৩ তারিখ মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি মো: হামিদুল হক ও বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরী ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ সরকার মামলায়, গত ৭ই এপ্রিল ২০০৩ তারিখ বিচারপতি এস,কে, সিনহা ও বিচারপতি শরিফউদ্দিন চাকলাদার সাইফুজ্জামান বনাম বাংলাদেশ সরকার মামলায়, ফৌজদারী কার্যবিধি ৫৪ ও ১৬৭ ধারায় গ্রেফতার ও রিমান্ডের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নির্দেশনা বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশনার আলোকে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহ নিম্নরূপ-

০১. ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটকাদেশ (ডিটেনশন) দেবার জন্য পুলিশ কোন ব্যক্তিকেই ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করতে পারবেন না।

০২. কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের পূর্বে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার তার পরিচয় দেবেন এবং প্রয়োজনে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিসহ উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকেও তার পরিচয়পত্র দেখাবেন।

০৩. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে থানায় আনার পর সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার দ্রুত গ্রেফতারের কারণসমূহ (অভিযোগ) লিপিবদ্ধ করবেন। যেমন-

- আমলযোগ্য অপরাধের সঙ্গে সম্পৃক্তার তথ্য
- অপরাধের বিস্তারিত বিবরণ
- যে পরিস্থিতিতে গ্রেফতার করা হয়েছে
- তথ্যের উৎস এবং বিশ্বাসযোগ্যতার কারণ
- স্থানের বর্ণনা, সময় ও গ্রেফতারের সময় উপস্থিত ব্যক্তিদের নাম, ঠিকানা থানায় রক্ষিত ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

০৪. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন পেলে পুলিশ তা লিপিবদ্ধ করবেন এবং কাছাকাছি কোন হাসপাতালে বা সরকারী ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করিয়ে চিকিৎসার সনদপত্র সংগ্রহ করবেন।

০৫. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে থানায় আনার ৩ ঘন্টার মধ্যে পুলিশ গ্রেফতারের কারণ/ অভিযোগ পত্র তৈরী করবেন।

০৬. কোন ব্যক্তিকে বাসস্থান বা কর্মস্থল থেকে গ্রেফতার করা না হলে, তাকে থানায় আনার এক ঘন্টার মধ্যে, পুলিশ তার আত্মীয়-স্বজনকে টেলিফোন বা লোক মারফত গ্রেফতারের সংবাদ জানাবেন।

০৭. পুলিশ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে তার পছন্দনীয় আইনজীবী বা নিকটাত্মীয়'র সঙ্গে পরামর্শ বা দেখা করার জন্য অবশ্যই অনুমতি দিবেন।

০৮. যখন কোন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ২৪ ঘন্টার মধ্যে হাজির করা হয়, তখন পুলিশ কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭(১) ধারা অনুযায়ী লিখিত বক্তব্য পেশ করবেন যে, কেন ২৪ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন হয়নি এবং কেন তিনি মনে করেন যে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ বা তথ্যগুলো যুক্তিসংগত/সুদৃঢ়। একই সঙ্গে তিনি মামলার প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পেশ করবেন।

০৯. যদি ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রেরণকৃত পত্রে ও মামলার লিখিত ডাইরীর বর্ণণা পড়ে সন্তুষ্ট হন যে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ বা তথ্যগুলো যুক্তিসংগত এবং তাকে জেলে রাখার যথেষ্ট উপকরণ মামলার ডাইরীতে রয়েছে, তবে তিনি গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেবেন, অন্যথায় তাৎক্ষণিকভাবে তাকে মুক্তি দেবেন।

১০. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ যুক্তিসংগত না হওয়ায় এবং তাকে জেলে রাখার যথেষ্ট উপকরণ মামলার ডাইরীতে না থাকায় যদি ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত ব্যক্তিকে মুক্তি দেন, তবে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯০ (১) (গ) ধারায় উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে আইনগত কার্যক্রম শুরু করবেন। একই সঙ্গে ওয়ারেন্ট ছাড়া উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার কারণে ঐ পুলিশ অফিসার ২২০ ধারা অনুযায়ী বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে বা উৎকোচ গ্রহণ করে উক্ত ব্যক্তিকে আটক রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন।

১১. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় জেল হাজতে প্রেরণ করার পরও সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার তদন্তের প্রয়োজনে উক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন। তবে জিজ্ঞাসাবাদের কক্ষটি এমন হতে হবে যার এক পাশে কাঁচের দেয়াল ও গ্রীল থাকবে - যাতে করে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়স্বজন বা আইনজীবী জিজ্ঞাসাবাদের দৃশ্যটি দেখতে পাবেন, কিন্তু শুনতে পাবেন না।

১২. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতের নেবার আবেদনপত্রে-

- জিজ্ঞাসাবাদের বিস্তারিত যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখ করতে হবে
- বিবেচনার জন্য মামলার কেস ডায়রীটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পেশ করতে হবে, যদি ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদনে সন্তুষ্ট হন, তাহলে তিনি কারণগুলো লিপিবদ্ধ করে গ্রেফতারকৃতকে পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর আদেশ দেবেন। তবে সেটা তিন দিনের বেশী অবশ্যই নয়।

১৩. যদি ম্যাজিস্ট্রেট গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে নেবার জন্য পুনরায় আদেশ দেন তবে এই মর্মে নিশ্চিত হবেন যে-

- গ্রেফতারের সময় উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের কারণ জানানো হয়েছিল।
- আটক ব্যক্তিকে তার পছন্দনীয় আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শের সুযোগ দেয়া হয়েছিল।
- পুলিশ হেফাজতে প্রেরণের পূর্বে ম্যাজিস্ট্রেট আটক ব্যক্তির আইনজীবীর বক্তব্যও শুনবেন।
- উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট আটক ব্যক্তিকে পুনরায় পুলিশ হেফাজতে প্রেরণের এই আদেশ অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার দায়রা জজ/মেট্রোপলিটন দায়রা জজের কাছে পাঠাবেন।
- অনুমোদন পাওয়া গেলে, হেফাজতে নেয়ার পূর্বে তদন্তকারী কর্মকর্তা অবশ্যই, নির্দিষ্ট সরকারী ডাক্তার বা মেডিকেল বোর্ড দ্বারা উক্ত আটক ব্যক্তির ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন করবেন এবং ডাক্তারী প্রতিবেদন উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পেশ করবেন।
- তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে উক্ত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করবেন। আটক ব্যক্তি যদি নির্যাতনের অভিযোগ করেন তবে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে পুনরায় ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য পূর্বের একই ডাক্তার বা মেডিকেল বোর্ড-এর কাছে প্রেরণ করবেন।
- যদি ম্যাজিস্ট্রেট ডাক্তার বা মেডিক্যাল বোর্ডের প্রতিবেদনে পুলিশ হেফাজতে আটককৃত ব্যাক্তিকে নির্যাতনের বা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার কোন প্রমাণ পান তবে তিনি ফৌজদারী কার্যবিধি ১৯০ (১) (গ) ধারায় উক্ত পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে আইনগত কার্যক্রম

শুরু করবেন। একই সঙ্গে উক্ত পুলিশ অফিসার দন্ডবিধির ৩৩০ ধারা অনুযায়ী, ভিত্তিহীন/অযৌক্তিক অপরাধে জড়িত থাকার স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য আটক ব্যক্তিকে নির্যাতন/পীড়ন করেছেন-এই অপরাধে অভিযুক্ত হবেন, যার সর্বোচ্চ শাস্তি ৭ বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড, এমনকি একই সাথে অর্থদন্ডও হতে পারে।

১৪. যদি থানা/পুলিশ হেফাজত/জেলখানায় আটক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, তবে সংশ্লিষ্ট থানার কর্মকর্তা/তদন্তকারী অফিসার/জেলার এই মৃত্যু খবর নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাবেন।

১৫. পুলিশ হেফাজতে বা জেলে মৃত্যুর সংবাদ পাবার পর অবশ্যই ম্যাজিস্ট্রেট অতিদ্রুত ঘটনাস্থলে যাবেন এবং কোন ধরণের অস্ত্রে বা কিভাবে শরীরে ক্ষত হয়েছে তা উল্লেখ করে মৃত্যুর কারণের প্রতিবেদন তৈরি করবেন। একই সঙ্গে মৃত ব্যক্তির ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করবেন।

১৬. উপর্যুক্ত এ সমস্ত নির্দেশনাসমূহ যথাসময়ে ও যথাযথভাবে মেনে না চললে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার এবং ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অবমাননার অপরাধে অভিযুক্ত হবেন।

গবেষণা প্রতিবেদন

Bangladesh Legal Aid and Services Trust *Bulletin (Special Issue)*, January 2008

Bangladesh Legal Aid and Services Trust. *Seeking Effective Remedies: Prevention of Arbitrary Arrest and Freedom from Torture and Custodial Violence.* Dhaka: BLAST, 2005.

Bangladesh Legal Aid and Services Trust, *The Advocacy Programme on the Use of Section 54 and 167 of CrPC by the Police Officers*. Dhaka: BLAST, 2008 (Unpublished Manuscript).

আইন

Barisal Metropolitan Police Act, 2009 (বরিশাল মহানগরী পুলিশ আইন, ২০০৯)

Chittagong Metropolitan Police Ordinance, 1978

Code of Criminal Procedure, 1898

Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976

Evidence Act, 1872

Khulna Metropolitan Police Ordinance, 1985,

Penal Code, 1860

Police Act, 1861

Rajshahi Metropolitan Police Ordinance, 1992(রাজশাহী মহানগরী পুলিশ আইন, ১৯৯২)

Special Powers Act, 1974

Sylhet Metropolitan Police Act, 2009 (সিলেট মহানগরী পুলিশ আইন, ২০০৯)

Torture and Custodial Death (Prevention) Act, 2013 (নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩)

মামলার রায় ও আদেশ

Ain–o-Salish Kendra and Others vs Bangladesh, 56 DLR (HCD) (2004) 620 (http://www.southasianrights.org/wp-content/uploads/2010/02/ASK-and-ors-v-Bangladesh-56-DLR-HCD-2004-620.pdf)

BLAST and others vs Bangladesh and others, 55 DLR (HCD) (2003) 363 (http://blast.org.bd/component/content/article/55-cj/214-3806of1998)

Civil Petition for Leave to Appeal No 498 of 2003 (Bangladesh Vs. BLAST)

Criminal Miscellaneous Case No. 10058 of 2011 (Moshrefa Mishu Vs. The State) (on file)

Nurul Islam Babul vs State, 56 DLR (HCD) (2004) 347

Saifuzzaman (Md) v State and others.Criminal Miscellaneous Case Nos. 9145 and 9146 of 2002, 56 DLR (HCD) (2004) 324 (http://www.southasianrights.org/wp-content/uploads/2010/02/Saifuzzaman-v-Bangladesh-and-others-56-DLR-_HCD_-_2004_-324.pdf)

প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন

Ali, Awlad J. Network for Improved Policing in South Asia (NIPSA) (November 2014). "Review of Implementation of the High Court directions on Section 54 and 167 of Code of Criminal Procedure. http://www.nipsa.in/update/archive/review-of-implementation-of-the-high-court-directions-on-section-54-and-167-of-code-of-criminal-procedure.html

Amnesty International Report 2014/15, https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/bangladesh/report-bangladesh/

AsiaNews.it (March 2015). "Bangladesh police wants torture ban overturned." http://www.asianews.it/news-en/Bangladesh-police-wants-torture-ban-overturned-33687.html

Halim, Abdul (July 2005). "Police power of arrest and remand." Law & Our Rights. Issue No.: 1999. The Daily Star. http://archive.thedailystar.net/law/2005/07/04/vision.htm

Md. NazmuzzamanBhuiyan, Police Remand: A Constitutional Controversy, 55 DLR 2003 (Journal) 1

Momtaz, Suraya (November 2013). "Human Rights Violations in Bangladesh: A Study of the Violations by the Law Enforcing Agencies." *Mediterranean Journal of Social Science* 4:13.http://www.google.com/l?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=62&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjABODxqFQoTCKvK4q77kMYCFQt5vAodWKAAkg&url=http%3A%2F%2Fwww.mcser.org%2Fjournal%2Findex.php%2Fmjss%2Farticle%2Fdownload%2F1492%2F1509&ei=MmJ-VavpBIvy8QXYwIKQCQ&usg=AFQjCNG_tabrW0BXRArZ4pftct0UJLj92Q&sig2=8_fF_AEOGkbbmuECXqqRmw&bvm=bv.95515949,d.dGc

নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন: নিজেদের সুবিধায় আইনের সংশোধন চায় পুলিশ, প্রথম আলো, মার্চ ০৫, ২০১৫

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) দেশের শীর্ষস্থানীয় জাতীয় আইন সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা। ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয় ছাড়াও দেশের ১৯টি জেলা শহরে ব্লাস্টের শাখা কার্যালয় রয়েছে। ব্লাস্ট এর লক্ষ্য হচ্ছে দেশের দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগণকে আইন সহায়তা প্রদান, ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সাধন এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এমন একটি পরিবেশ নিশ্চিত করা যা তাদের প্রতি সহানুভূতি, নিরপেক্ষ, বন্ধুসুলভ ও আধুনিক। আইন সহায়তার পাশাপাশি ব্লাস্ট PIL ও Advocacy এর মাধ্যমে নীতি নির্ধারণ, আইন প্রণয়ন, সংস্কার সাধন এবং বিচার ব্যবস্থার আধুনিকায়নের মাধ্যমে সকলের স্বার্থ সংরক্ষণ করে এমন ধরনের সামাজিক উন্নয়ন সাধন করার লক্ষ্যে ব্লাস্ট নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে:

ক) বিনামূল্যে আইন সহায়তা ও সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি: ব্লাস্ট বিনামূল্যে আইনগত পরামর্শের পাশাপাশি নির্যাতিত, অসহায় ও গরীব মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি ও বিনামূল্যে মামলা পরিচালনা করে।নারী নির্যাতনের মামলাসহ পারিবারিক, যৌতুক, বহুবিবাহ, শ্রম, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলাসমূহ পরিচালনা করে। অপরদিকে প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে দেশের যে কোন স্থান থেকে পাঠানো গরীব ও অসহায় মানুষের মামলাসমূহ মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট এবং আপীল বিভাগে বিনামূল্যে পরিচালনা করা হয়।

খ) তথ্যানুসন্ধান বা তদন্ত: ব্লাস্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক বিভিন্ন ঘটনার তথ্যানুসন্ধান বা তদন্ত একক এবং যৌথভাবে পরিচালনা করে। এছাড়া পারস্পারিক অভিজ্ঞতা ও তথ্য বিনিময়, যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ) সচেতনতা কার্যক্রম: ব্লাস্ট স্থানীয় গরীব, অসহায় জনসাধারণ, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও বিশেষ করে শ্রমিক ও বস্তিবাসী মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ সচেতনতা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হল দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় আইন, মানবাধিকার, মৌলিক অধিকারসহ বিভিন্ন অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে জানানো এবং সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে বিচার প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

ঘ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: ব্লাস্ট অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক-এর মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি, প্যানেল আইনজীবী, স্টাফ, শ্রমিক, কারখানার মধ্য-পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন পর্যায়ে সালিস, দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় আইন, শ্রম আইন, জেন্ডার, মানবাধিকার, নারীর অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

ঙ) জনস্বার্থ মামলা (PIL): ব্লাস্ট ১৯৯৪ সাল থেকে জনস্বার্থ মামলা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ পর্যন্ত ব্লাস্ট ৮৪টি জনস্বার্থ (PIL) মামলা করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- প্রতিবন্ধীদের চাকুরীর সুযোগ, অবৈধভাবে বস্তি উচ্ছেদ রোধ, অবৈধ জমি অধিগ্রহণ রোধ, স্থানীয় সরকার যেমন- গ্রাম সরকার ও গ্রাম পরিষদ আইনের বৈধতা, ক্ষতিপূরণ আদায়, ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা অপপ্রয়োগ রোধ, বিচার বর্হিভূত হত্যাকান্ড প্রতিরোধ, সরকারী চাকুরীতে নারী-পুরুষ বৈষম্য রোধ, পরিবেশ রক্ষা, ভোক্তা অধিকার, বিনাবিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রামে ডিস্ট্রিক্ট, সেশন কোর্ট এবং পারিবারিক কোর্ট স্থাপন, সালিসের নামে বেআইনী সাজা বন্ধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাস্তির নামে শিশুদের নির্যাতন বন্ধ সংক্রান্ত মামলা।

চ) অধিপরামর্শ (Advocacy): মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরী, আইন ও পুলিশির সংশোধন, পরিবর্তন, বাস্তবায়নের জন্য ব্লাস্ট অধিপরামর্শমূলক কর্মসূচী পরিচালনা করে। ব্লাস্ট একদিকে সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন আইন, মানবাধিকার, মৌলিক অধিকারসহ বিভিন্ন অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করছে। অপরদিকে বারের আইনজীবী, সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের প্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতা, সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তা, বিচার বিভাগের প্রতিনিধি ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের সংবেদনশীল এবং সচেতন করাসহ বিভিন্ন আইন ও নীতি বিষয়ে গবেষণা, জরিপ, সভা, ওয়ার্কশপ, সংলাপ ও সেমিনারের মাধ্যমে মতামত বা সুপারিশ সংগ্রহ করে।

ছ) ইমপ্রুভমেন্ট অব দি রিয়্যাল সিচুয়েশন অব ওভারক্রাউডিং ইন প্রিজনস প্রকল্প: ব্লাস্ট দেশের কারাগারের সার্বিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে GIZ এর সহায়তায় এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন জেলার কারাগারে কাজ করছে এবং বিনা বিচারে আটক বন্দীসহ অসহায়, আর্থিকভাবে অসচ্ছল বন্দীদের মুক্তির জন্য আইন সহায়তা প্রদান করছে।

জ) প্রমোটিং জেন্ডার জাস্টিস থ্রু লিগ্যাল এমপাওয়ারমেন্ট অব লোকাল কমিউনিটি ইন রুরাল বাংলাদেশ প্রকল্প: ব্লাস্ট Diakonia এর সহায়তায় ৪টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পিরোজপুর, দিনাজপুর, যশোর এবং কুমিল্লা জেলার ৪ ইউনিয়নের ৩৬টি ওয়ার্ডের তৃণমূল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সালিসের মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তি, সচেতনা কার্যক্রমসহ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ঝ) গবেষণাকর্ম, আইন বিষয়ক পুস্তিকা, প্রতিবেদন, আইনগ্রন্থ এবং বুলেটিন প্রকাশ: ব্লাস্ট বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাকর্ম, বুকলেট, লিফলেট, বুলেটিনসহ আইন বিষয়ক পুস্তক প্রকাশ করে। এছাড়া ব্লাস্টের কার্যক্রম এবং ইস্যুভিত্তিক একটি ত্রৈমাসিক বুলেটিন প্রকাশ করা হয়।

সিএইচআরআই এর কার্যক্রমসমূহ

সিএইচআরআই কাজ করছে প্রধানত কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহে। সিএইচআরআই বিশ্বাস করে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনে গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও মানবাধিকারের বাস্তব প্রয়োগ ঘটাতে হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল কর্মকান্ডে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহন প্রয়োজন। একই সঙ্গে প্রয়োজন এ সব কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা। অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করতে মানসম্মত কার্যকর কাঠামো থাকতে হবে। এই বিশ্বাসই সিএইচআরআই এর সকল কার্যক্রমের ভিত্তি। সে আলোকেই মানবাধিকার বিষয়ে ব্যাপকভিত্তিক এডভোকেসির পাশাপাশি সহজে তথ্য জানার অধিকার এবং বিচার প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের অভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্য সিএইচআরআই কাজ করছে। সিএইচআরআই এর কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে গবেষণা, প্রকাশনা, কর্মশালার আয়োজন, পারস্পরিক জ্ঞান ও তথ্য বিনিময় এবং এডভোকেসি।

মানবাধিকার এডভোকেসি কর্মসূচী:

কমনওয়েলথ এর আনুষ্ঠানিক দপ্তরসমূহ এবং কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সরকারসমূহের কাছে সিএইচআরআই নিয়মিত মানবাধিকার বিষয়ক স্মারকলিপি জমা দিয়ে থাকে। পাশাপাশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সিএইচআরআই বিভিন্ন স্থানে তথ্যানুসন্ধান দলও প্রেরণ করে। ১৯৯৫ সাল থেকে সিএইচআরআই নাইজেরিয়া, জাম্বিয়া, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ এবং সিয়েরা লিয়নে মিশনে পাঠিয়েছে এবং কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ নেটওয়ার্ক এর সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেছে। এ ছাড়া সিএইচআরআই এর মিডিয়া ইউনিট ও মানবাধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা অব্যাহত রাখার কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

তথ্য জানার অধিকার:

তথ্য অধিকার বিষয়ে বিশেষায়িত জ্ঞান ও কৌশলগত দক্ষতা রয়েছে সিএইচআরআই এর। এ বিষয়ে ফলপ্রসু আইনগত কাঠামো গড়ে তুলতে এবং অনুসরণমূলক কোন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সিএইচআরআই সহযোগী সংস্থা ছাড়াও বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজ এবং সরকারের সহায়কের ভূমিকায় কাজ করে। এসব কর্মকান্ডের লক্ষ্য হলো তথ্য অধিকার বিষয়ক কাজে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং নীতি নির্ধারকদের তথ্য অধিকারের স্বপক্ষে উদ্বুদ্ধ করা।

সিএইচআরআই দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তথ্য অধিকার বিষয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। সম্প্রতি তারা ভারতে তথ্য অধিকার আইন পাসের উদ্দেশ্যে একটি সফল প্রচারাভিযান পরিচালনা

করছে। তাছাড়া অতি সম্প্রতি তারা এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে এবং আফ্রিকার কয়েকটি দেশে তথ্য অধিকার বিষয়ক আইনের খসড়া তৈরীতে সহায়তা দিয়েছে। তথ্য অধিকারের স্বপক্ষে ভূমিকা রাখতে এ অঞ্চলের জাতীয় ও আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর সাথে সিএইচআরআই অনুঘটকের ভূমিকা ও পালন করছে।

বিচার প্রক্রিয়ায় অভিগম্যতা:

পুলিশ বাহিনীর সংস্কার

অনেক দেশেই পুলিশ নাগরিকদের রক্ষাকারী না হয়ে রাষ্ট্রের নির্যাতনমূলক একটি হাতিয়ার হিসেবে অবতীর্ণ হচ্ছে। ফলে ঐ সকল দেশে অধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপক ঘটনা ঘটে এবং বিচার প্রাপ্তির অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয় অনেক মানুষ। সিএইচআরআই পুলিশ বাহিনীর দর্শনগত ও পদ্ধতিগত সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। সিএইচআরআই মনে করে এ প্রক্রিয়াতেই কেবল পুলিশ তার বর্তমান নির্যাতনমূলক ভূমিকার পরিবর্তে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারে। ভারতে সিএইচআরআই মূলত পুলিশ বাহিনীর সংস্কারের স্বপক্ষে জনসমর্থন বৃদ্ধি ও জনগণকে সংঘবদ্ধ করার জন্য কাজ করছে। পূর্ব আফ্রিকায় এবং গায়নায় সিএইচআরআই পুলিশ বাহিনীর জবাবদিহিতা এবং তাদের কার্যক্রমে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

কারা সংস্কার

ঐতিহাসিকভাবে কারা অভ্যন্তরে যে গোপানীয়তার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তাতে স্বচ্ছতার পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং সেখানকার দুর্নীতি ও অন্যায়গুলো জনসম্মুখে তুলে ধরাই হলো সিএইচআরআই এর কর্মসূচির মূল বিষয়। এক্ষেত্রে অন্যতম একটি কার্যক্রম হলো, কারাগারগুলোতে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে কারাবন্দিদের যে আধিক্য তা কমাতে বিদ্যমান আইনগত সীমাবদ্ধতার প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করা। তাছাড়া প্রায় নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর কারা পরিদর্শন ব্যবস্থাকে সক্রিয় করে পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করাও সিএইচআরআই এর মনোযোগের আরেকটি ক্ষেত্র। সিএইচআরআই মনে করে, এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে কারা প্রশাসনের সেবার মানোন্নয়নে পরিবর্তন আনা যেমন সম্ভব তেমনি বিচার প্রশাসনেও একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলা সম্ভব।

This book has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this pamphlet are the sole responsibility of BLAST and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

এই প্রকাশনাটি ইউরোপিয়ন ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় প্রকাশিত হয়েছে। এখানে প্রকাশিত সকল মতামত ব্লাস্টের নিজস্ব এবং কোনভাবেই তা ইউরোপিয়ন ইউনিয়নের মতামতের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হবে না।

১/১ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
টেলিফোন: +৮৮ ০২ ৮৩৯১৯৭০-৭২, ৮৩১৭১৮৫, ফ্যাক্স: ৮৮ ০২ ৮৩৯১৯৭৩
ই-মেইল: mail@blast.org.bd
ওয়েবসাইট: www.blast.org.bd

কমনওয়েলথ হিউমেন রাইটস্ ইনেশিয়েটিভ
৫৫/এ সিদ্ধার্থ চেম্বারস্, (২য় তলা) কালু সরাই নিউ দিল্লী ১১০০১৬
ফোন: ৯১ ১১ ৪৩১৮০২০০; ৪৩১৮০২০১
ফ্যাক্স: ৯১ ১১ ২৬৮৬৪৬৮৮
ই-মেইল: info@humanrightsinitiative.org
ওয়েবসাইট: www.info@humanrightsinitiative.org

Delegation of the European Union to India
49, Sunder Nagar, New Delhi – 110003
Phone: +91-11-42195219
Fax: +91-11-41507206, 07
Website: http://eeas.europa.eu/delegations/ondia/index_en.htm

The contents of this report are the sole responsibility of BLAST and CHRI and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union. This publication has been produced with the financial assistance of the European Union. The European Union is made up of 27 Member States who have decided to gradually link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders.